ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অনুশীলন বই

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জেনারেল স্যাম মানেকশ
ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান

এডওয়ার্ড কেনেডি
আমেরিকান সিনেটর

পন্ডিত রবিশঙ্কর
ভারতীয় সেতারবাদক ও সঙ্গীতশিল্পী

উইলি ব্রান্ট
চ্যান্সেলর
জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক

আলেক্স কোসিজিন
রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

মার্শাল টিটো
যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট

আঁন্দ্রে মালরোঁ
ফরাসি লেখক ও রাজনীতিবিদ

জে.এফ.আর. জ্যাকব
ভারতীয় সেনাবাহিনীর
লেফটেন্যান্ট জেনারেল

সিডনি শনবার্গ
আমেরিকান সাংবাদিক

এলেন গিন্সবার্গ
আমেরিকান কবি

সায়মন ড্রিং
ব্রিটিশ সাংবাদিক

উইলিয়াম এ এস অর্ডারল্যান্ড
অস্ট্রেলিয়ান, বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী কয়েকজন বিদেশি বন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অনুশীলন বই

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক স্বাধীন সেন
অধ্যাপক আকসাদুল আলম
ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু
অধ্যাপক পারভীন জলী
ড. সুমেরা আহসান
মুহাম্মদ রকিবুল হাসান খান
উমা ভট্টাচার্য
সিদ্দিক বেলাল
বহ্নি বেপারি
সানজিদা আরা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

প্রমথেশ দাস পুলক
তামান্না তাসনিম সুপ্তি

প্রচ্ছদ

ইউসুফ আলী নোটন

গ্রাফিক্স

মো: রুহুল আমিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

নতুন বছরে নতুন শ্রেণিতে তোমাদের অভিনন্দন, স্বাগত।
তোমাদের জন্য পড়ালেখার নতুন এক পদ্ধতি নিয়ে আমরা অপেক্ষায় আছি। এ পদ্ধতিতে তোমাদের আর পরীক্ষা এবং ভালো নম্বরের পিছনে ছুটতে হবে না। কেবল পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্ন জানা আর সেসবের উত্তরের খোঁজে থাকতে হবে না। এখন থেকে উত্তর মুখস্থ করাও তোমাদের মূল কাজ নয়। বাবা-মায়েরও ভালো টিউটর, কোচিং সেন্টার, গাইড বই আর তোমাদের পরীক্ষা ও প্রশ্ন নিয়ে উদ্বেগে কাটাতে হবে না। অযথা অনেক টাকাও খরচ করতে হবে না।

আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকের রয়েছে এক একটা সতেজ মন আর একটা করে খুবই সক্রিয় মস্তিষ্ক। তোমাদের কল্পনা শক্তি যেমন আছে, তেমনি আছে বুদ্ধি, তা খাটিয়ে পেয়ে যাও ভাবনার নানা পথ। মন আর মস্তিষ্কের মতো আরও কয়েকটা যোগ্যতা নিয়েই জন্মেছ সবাই। এগুলোর কথা বিশেষভাবে বলতে চাই। বলছি মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তির কথা। তোমরা আগেই জেনেছ আমাদের সবার আছে পাঁচটি করে বিশেষ প্রত্যঙ্গ– চোখ, কান, নাক, জিহ্বা আর ত্বক। এগুলো ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, এ হলো দৃষ্টিশক্তি, আর এটিকে বলি দর্শনেন্দ্রিয়। তেমনি কানে শুনি, এটি শ্রবণেন্দ্রিয়, নাক দিয়ে শুঁকি বা ঘ্রাণ নেই, এটি ঘ্রাণেন্দ্রিয়। জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি, এটি স্বাদেন্দ্রিয়; আর ত্বক দিয়ে স্পর্শ করি, এটি স্পর্শেন্দ্রিয়। কিছু চিনতে, বুঝতে, জানতে এগুলো আমাদের সহায়তা করে। তাই ইন্দ্রিয়গুলো এত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ।

এতসব সম্পদ মিলিয়ে তোমাদের প্রত্যেকের আছে–

অফুরন্ত প্রাণশক্তি

সীমাহীন কৌতূহল

আনন্দ পাওয়ার অসীম ক্ষমতা এবং

বিস্মিত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা।

আধুনিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পরীক্ষা আর উত্তর মুখস্থ করার যে চাপ, তাতে তোমাদের এসব স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ব্যাহত হয়। শিক্ষায় বরং শিক্ষার্থীদের এই ক্ষমতাগুলোকেই কাজে লাগানো দরকার, তাতেই ভালো ফল মিলবে।

এ থেকে তোমাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে একটু ধারণা নিশ্চয় পেয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ এই ব্যবস্থায় তোমরা বেশ স্বাধীনতা পাচ্ছ। তবে ভুলো না, স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে দায়িত্বও নিতে হয়। আচ্ছা, পড়ালেখাটা তো তোমার নিজেরই কাজ, নিজের জন্যই। তো নিজের কাজ নিজে করবে, এতো খুব ভালো কথা।

তবে আসল কথা হলো, কোনো কাজে যখন নিজেই সফল হবে, তাতে আনন্দ যে কত বেশি তা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারো। তাই নতুন পথে শিক্ষা হবে আনন্দময় যাত্রা, পথচলা। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে– যাত্রাপথের আনন্দগান। শিক্ষা হলো আনন্দগান সেই অভিযাত্রা– যেন গান করতে করতে পথ চলেছ।

তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে মাত্রই উঠেছ। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ। নতুন শ্রেণির পাঠের অনেক কিছুই হবে নতুন, অনেকটা অজানা। তবে অজানা আর নতুন বলেই তো এ পথচলাটা হবে অভিযানের মতো। পথে যে চ্যালেঞ্জ থাকবে সেগুলো পেরোনোর অভিজ্ঞতা থেকে যেমন অনেক কিছু জানবে, শিখবে, করবে, তেমনি পাবে অফুরন্ত আনন্দ।

অথচ এর জন্য বাড়তি কোনো খরচ লাগবে না। কারণ চ্যালেঞ্জ মোকবিলার জন্য তোমাদের ভাঁড়ারে আছে নিজস্ব শক্তিশালী হাতিয়ার– কৌতূহল, বিস্ময়বোধ, প্রাণশক্তি এবং আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়গুলো এতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। আর মজা হলো এগুলো টাকাপয়সার মতো নয়, ব্যবহারে খরচ না হয়ে বরং বাড়ে। কারণ এসবই তোমার মনের সম্পদ, তুমি যত চর্চা করবে, ততই এগুলো ঝকঝকে থাকবে, কাজে হবে দক্ষ। বরং এগুলোর প্রেরণায় তোমাদের নতুন নতুন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে। প্রথম ডাক পড়বে বুদ্ধির। নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে হবে, ভাবতে হবে, আবার ভাবতে গেলে যুক্তির প্রয়োজন। এ হলো চর্চার বিষয়–বুদ্ধি খাটালে তা আরও বাড়বে, দেখবে কোনো কোনো গাছের ডাল-পাতা ছেঁটে দিলে গাছটি বাড়ে ভালো, ফলও দেয় বেশি। তোমাদের চাই বুদ্ধিকে খাটানো, যুক্তিতে শান দেওয়া। আর ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রাখতে হবে, তাতে এগুলোয় দক্ষতাও বাড়তে পারবে।
এভাবে অজানাকে জয় করবে, অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে চলতে চলতে বিস্ময়ে-আনন্দে মজে কখন যে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তবে শুরু হোক এই জয়যাত্রা!

সূচিপত্র

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চল থেকে 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যুদয়ের ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধু	১-৭
যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কীভাবে?	৮-৪৩
সম্প্রদায়	৪৪-৬১
মুক্তিযুদ্ধের দেশি ও বিদেশি বন্ধুরা	৬২-৭৯
সামাজিক মূল্যবোধ ও রীতি-নীতি	৮০-১০৯
সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা	১১০-১৩৪
টেকসই উন্নয়ন ও আমাদের ভূমিকা	১৩৫-১৬৩

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ এর অভ্যুদয়ের ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধু

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল দিয়ে বছর শুরু হলো। নীলান্ত এবার ৭ম শ্রেণিতে। বাংলা অঞ্চলে মানুষজন গোত্রবদ্ধ জীবন থেকে কীভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল সেই ইতিহাসে মগ্ন হয়ে আছে সে। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে খুশি আপা ইতিহাসের এই বিষয়গুলো খুব সহজভাবে পড়িয়েছিলেন। নীলান্ত-র মনে তারপরেও নানান চিন্তা ও প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে সে এই ভেবে আনন্দিত যে, ৭ম শ্রেণিতে খুশি আপার কাছ থেকে তার চিন্তা ও প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবে এবং এই ইতিহাসের আরো কিছু নতুন তথ্য বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে। খুশি আপা ক্লাসে এলেন। হাসিমুখে সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন। তাঁর হাতে নতুন বছরের নতুন বই – ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান। তিনি সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ইতিহাস বিষয়ে কী পড়েছিলে মনে আছে? নীলান্ত দাঁড়িয়ে উত্তর দিলো, বাংলার ভৌগোলিক অঞ্চলে একদল মানুষের বহুবিচিত্র প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, গোত্রবদ্ধ জীবন থেকে সমাজ-রাজনীতি গঠন ও সেই ভূখণ্ডের পূর্ব অংশে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতার কিছু ইতিহাস আপনি পড়িয়েছিলেন। ৭ম শ্রেণিতে এই ইতিহাসের আরো বিস্তারিত তোমরা জানতে পারবে, বললেন খুশি আপা।

কাল পরম্পরায় বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সংগ্রাম

তোমরা হয়তো খেয়াল করে থাকবে, বাংলা অঞ্চলে প্রাচীন মানুষের খাদ্য সংগ্রহ ও শিকারের কথা বলতে গিয়ে সহজলভ্যতার কথা আমরা অনেকবার বলেছি। এখানকার ভূমি ছিল উর্বর, তাই ফলমূলের আধিক্য ছিল বরাবরই। বন-জঙ্গলে আরো ছিল খাবার উপযোগী প্রচুর সামগ্রী আর নদীগুলো ছিল মৎস্য সম্পদে পরিপূর্ণ। বাংলা অঞ্চলের মানুষের দেহ-গড়ন, ভাষা ও সংস্কৃতিতে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে আদি কাল থেকেই বহুবিচিত্র জনধারা এবং ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ এখানে এসেছে এবং খাদ্যের প্রাচুর্য দেখে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রাকৃতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছে। সহজলভ্য খাদ্য ও অন্যান্য সম্পদের লোভেই যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন রাজবংশ, সৈনিক ও যোদ্ধারা বাংলা অঞ্চল আক্রমণ করেছে। কখনও তারা লুটপাট করে চলে গিয়েছে, কখনও আবার স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে নিজেদের ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এই দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে তাই খাদ্যের প্রাচুর্য যেমন ছিল, তেমনই নানা রকম প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিকূলতাও ছিল।

বাংলা অঞ্চলের ভূমি বরাবরই বিরল বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়। এই অঞ্চলের উত্তরে হিমালয় পর্বত, পূর্ব ও পশ্চিমের অন্যান্য পার্বত্য এলাকা থেকে নেমে আসা নদীগুলো বাংলায় প্রবেশ করে অসংখ্য শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে। সমস্ত অঞ্চলটিকে জালের মতো জটাকারে আবদ্ধ করেছে। বন- জঙ্গল এবং নদীতে যেমন রয়েছে সহজ খাদ্যের জোগান, তেমনই রয়েছে সাপ, কুমির, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জীব জন্তু এবং বিষাক্ত কীট-পতংগের প্রকোপ। ঝড়-তুফান আর বন্যা এ অঞ্চলের মানুষের নিত্যসঙ্গী। উঁচু-নিচু জলাভূমি সমতল করে, বন-জঙ্গল পরিষ্কার করেই তাদের তৈরি করতে হয়েছে নিজেদের বাসভূমি এবং চাষক্ষেত্র। এখানে খাদ্যের জোগান সহজ হলেও মানুষের জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি তুরস্ক,

পারস্য, আফগানিস্তান, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত, ইউরোপসহ নানা স্থান থেকে আসা যোদ্ধা এবং রাজাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধেও কখনও লড়াই করে, কখনও আপোষ-মীমাংসা করে বাংলা অঞ্চলের মানুষকে টিকে থাকতে হয়েছে।

খুশি আপা বাংলা অঞ্চলে প্রাচীনকালের মানুষের জীবন-সংগ্রামের উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ৬ষ্ঠ শ্রেণির অনুসন্ধানী বইয়ে তোমরা ইতিহাসের অনেক বিস্তারিত তথ্য পড়েছ। বাংলা অঞ্চলে প্রাচীনকালের মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতির অভিজ্ঞতা জেনেছ। ৭ম শ্রেণির অনুসন্ধানী বইয়েও তোমরা দক্ষিণ এশিয়ায় কীভাবে মানুষ সভ্যতা নির্মাণে এগিয়েছে তার অনেক তথ্য পাবে। দক্ষিণ এশিয়ার পূর্ব অংশ যেখানে বাংলা অঞ্চল অবস্থিত, সেখানকার মানুষের জীবন-সংগ্রাম এবং সভ্যতা বিনির্মাণের দ্বন্দ্বমুখর ইতিহাস জানাটা আমাদের জন্যে নিশ্চয়ই আনন্দের হবে। কেননা এই বাংলা অঞ্চলের পূর্ব অংশেই প্রাচীন 'বঙ্গ' জনপদ থেকে ধীরে ধীরে 'বঙ্গাল', তারপর 'বাঙ্গালা' এবং ১৮ শতক থেকে 'বেঙ্গল' নামে পরিচিতি গড়ে ওঠে। তোমরা বড় হয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবে যে, এই 'বেঙ্গল' বা 'বাংলা' পরবর্তীকালে কীভাবে 'পূর্ব বাংলা' আর 'পশ্চিম বাংলা' নামে বিভক্ত হয় এবং পূর্ব অংশে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হয়।

বাংলা অঞ্চলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সংযোগ আর অভিজ্ঞতার কথা জানতে ক্লাসের সবার মতোই নীলান্ত উদগ্রীব হয়ে আছে। খুশি আপার কাছে নীলান্ত জানতে চাইল, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে হরপ্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে আমাদের অনুসন্ধানী বইয়ে ছবিসহ দেখেছি। বাংলা অঞ্চলে কি এমন কোনো সভ্যতার কথা জানা যায়? খুশি আপা জানালেন, দক্ষিণ এশিয়ায় সভ্যতা নির্মাণের পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতার মতোই বাংলা অঞ্চলের মানুষজনও নিজেদের মতো করে সভ্যতা নির্মাণ করেছিল। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা পান্ডু রাজার ঢিবির কথা পড়েছ। এছাড়া পুণ্ড্রনগর, তাম্রলিপ্তি, সমতটসহ অনেকগুলো স্থানে নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে দেব, চন্দ্র, পাল এবং সেন রাজবংশ বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময় রাজত্ব করতে শুরু করে। উত্তর ভারতে এই সময় বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাজবংশ তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যাদের মধ্যে রয়েছে মৌর্য্য, কুষাণ, গুপ্তসহ নানা রাজবংশ। এসব রাজবংশের উচ্চাভিলাষী রাজাদের কর্মকান্ড তোমরা অনুসন্ধানী বইয়ে দেখতে পাবে। উত্তর ভারতের ক্ষমতাকেন্দ্রিক এই রাজনীতি ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সকল তথাকথিত অভিজাত রাজক্ষমতাশালীরা পূর্বদিকে তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে গিয়ে বাংলা অঞ্চলেও বারবার আক্রমণ পরিচালনা করেছে, দখল করেছে। এই রাজবংশের রাজাদের ধর্ম, ভাষা যাই হোক না কেনো তারা ছিলেন ক্ষমতালোভী আর উচ্চাভিলাষী। নিজেদের নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তার করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীনকালের যুগধর্ম অনুযায়ী হিন্দু, বৌদ্ধ রাজাদের মতো মধ্যযুগেও মুসলিম রাজারা একই প্রক্রিয়ায় যুদ্ধ, দখলদারিত্ব চালিয়েছেন। প্রাচীন যুগের মতো মধ্যযুগের রাজারাও ভারত ও বাংলা অঞ্চল দখলে নিয়ে সুলতানি ও মুঘল নামে শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় বণিকদের হাত ধরে এই অঞ্চলে একই প্রক্রিয়ায় দখলদারিত্ব অব্যাহত রেখেছে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজসহ স্বার্থ ও সুবিধাবাদী নানা জাতি। তাদের ক্ষমতা বিস্তার আর সম্পদ দখলের রাস্তা ধরে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ শুরু হয় ১৯৪৭ সাল থেকে। এই সকল শাসন-শোষণের অবসান হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

অনুসন্ধানী বই দেখে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারত ও বাংলা শাসনকারী রাজবংশের পৃথক পৃথক দুটি তালিকা তৈরি করো।

বাংলা অঞ্চলে ক্ষমতার পালাবদল

খুশি আপা খুব সহজভাবে বলতে শুরু করলেন, সাধারণ অব্দ ১৩ শতক পর্যন্ত সময়ের পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলের অধিবাসীরা গোত্রজীবন থেকে রাষ্ট্র গঠনের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল সেখানে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় ১৩ শতকের পর থেকে। ১২ শতক এবং ১৩ শতকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত বাংলা অঞ্চল শাসন করছিল দক্ষিণ ভারত থেকে আগত উচ্চাভিলাষী ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজবংশ। নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তারে ব্যতিব্যস্ত এই বংশের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ রাজা বিজয়সেন বৃহৎ পরিসরে বেশ কিছু যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। সেন বংশের পরবর্তী রাজাদের মধ্যে বল্লালসেন এবং লক্ষণসেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রবর্তন এবং সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সমাজে এই ঘটনা বহুবিচিত্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনাকারী শক্তি হিসেবে পাল ও সেন রাজাদের মতোই পরবর্তী সময় বাংলা অঞ্চলের রাজক্ষমতা অল্প কিছু মানুষের হাতে পরিচালিত হয়। কতিপয় অভিজাত এবং ভাগ্যান্বেষী মুসলমান সৈনিক ও যোদ্ধার আগ্রাসন ১৩ শতক থেকে উত্তর ভারতের মতোই বাংলা অঞ্চলেও শুরু হয়। বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবনে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয় নতুন কয়েকটি রাজশক্তি, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি। সুদূর তুরস্ক থেকে আগত ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে আঞ্চলিক বাংলার উত্তর এবং পশ্চিম সীমানার বেশ কিছু অংশ দখল করে নেন। এই দখলের প্রক্রিয়ায় তিনি বেশ কিছু বিহার এবং পাঠাগার ধ্বংস করেন। বখতিয়ার খলজীর হাত ধরেই বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের শাসন শুরু হয়। এরপর আলী মর্দান খলজী, শিরান খলজী, ইওজ খলজী প্রমুখ বাংলার বেশ কিছু অংশে রাজত্ব শুরু করেন। তারা নির্মাণ করতে শুরু করেন মসজিদ-মাদ্রাসা। বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী আদি অধিবাসীদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির সংগে মুসলমানদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো মিল ছিল না। কিন্তু ইসলামের সাম্য, মানবতা ও উদারতার গুণ বাংলার সাধারণ মানুষকে বেশ আকর্ষণ করেছিল।

মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল দখল করে নিলে দিল্লির ইতিহাসবিদ শামস-ই-সিরাজ আফিফ তাঁকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' উপাধি প্রদান করেন। ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ, গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ, রাজা গণেশ, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, নসরত শাহের মতো রাজা/সুলতান বাংলার রাজক্ষমতায় আসীন হন। ভারতবর্ষ তথা বাংলা অঞ্চলে বহু দূরের ভূখণ্ড থেকে আগত এসব শক্তির বিরুদ্ধে সমবেতভাবে লড়াই করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের ছিল না। তারা ছিল শান্তিপ্রিয়। ইসলামও শান্তি এবং সকল মানুষের সহাবস্থানের বাণী প্রচার করে। সাধারণ মানুষের সংগে তাই মুসলমান শাসকদের খুব একটা দূরত্ব ছিল না। কিন্তু দূরত্ব আর দ্বন্দ্ব ছিল দিল্লির মুসলমান সুলতান এবং রাজাদের সংগে বাংলার মুসলমান সুলতান এবং রাজাদের। দিল্লির সুলতান প্রায়শই বাংলার সুলতান বা কোনো একজন শাসককে দমন বা অধীনস্থ করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। বাংলার রাজক্ষমতা দখলে নিয়ে দিল্লির সুলতান যাকে অনুগত মনে করে দায়িত্ব দিতেন, দেখা যেত অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। বাংলা অঞ্চলকে অনেক ইতিহাসবিদ সেই সময় 'বলগাখপুর' বা 'বিদ্রোহের নগরী' বলেও বিভিন্ন লেখনীতে উল্লেখ করেন। যাই হোক, দিল্লির মুসলমান শাসকদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলা অঞ্চলের মুসলমান শাসকগণ প্রায় ২০০ বছরের 'স্বাধীন সুলতানদের আমল' প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বলে ইতিহাসবিদ সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের সম্পূর্ণ অংশে এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল তা বলা যাবে না। বিভিন্ন সময় বাংলার বিভিন্ন অংশে মুসলমানদের ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। তাই ইতিহাসবিদগণের অনেকেই ১৩ থেকে ১৬ শতক এবং ১৬ থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত সময়কে “সুলতানি আমল”, "মুঘল আমল" বা “মুসলিম শাসন আমল” বলে যেভাবে চিহ্নিত করে থাকেন, বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় বলেই আধুনিক গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে।

বাংলা অঞ্চল দখলে নিয়ে মুসলমানদের শাসন শুরু হলেও এখানকার প্রজারা ছিল প্রায় সবাই হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনায় যুক্ত লোকধর্মের অনুসারী। এ সময় বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে পীর সুফি দরবেশরা বসতি স্থাপন করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নিজেদের ধর্ম প্রচারের চেষ্টায় নিয়োজিত হন। পীর, সুফি, দরবেশ বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় খানকাহ স্থাপন করে অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক বা ব্রাহ্মণ্য-সমাজ কাঠামোতে পিছিয়ে থাকা সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচারের প্রয়াস চালান। ধীরে ধীরে ইসলামের উদার, মানবিক এবং সহিষ্ণুতার নীতি বাংলা অঞ্চলের মানুষদের আকৃষ্ট করতে থাকে। বাংলা অঞ্চলে ইসলামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষও ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। প্রথম দিকে এই প্রক্রিয়া ছিল ধীরগতিসম্পন্ন। আস্তে আস্তে বিপুলসংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৮৭২ সালে ভারতে পরিচালিত প্রথম আদমশুমারিতে দেখা যায়, ভারতবর্ষের পূর্বাংশে অর্থাৎ বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশি। আবার বাংলা অঞ্চলের পশ্চিম অংশের তুলনায় পূর্ব অংশে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ছিল মুসলমান। বাংলায় মুসলমান শাসকদের অবদানের তুলনায় ইসলাম ধর্ম প্রচারক অর্থাৎ পীর, সুফি, দরবেশগণের কর্মকাণ্ড ইসলাম প্রচারে অনেক বেশি কার্যকর হয়েছে বলে গবেষণায় দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০ শতকে নানা ধরনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে মুসলমানদের সংখ্যা আগের চেয়েও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়।

মুঘল শক্তির অধীনে বাংলা

অনুসন্ধানী বইয়ের শেষ অধ্যায়ে 'সুলতানি আমল ও বাংলা' সম্পর্কে আরো আলোচনা রয়েছে জানিয়ে খুশি আপা আবার বলা শুরু করলেন, ১৬ শতক থেকে বাংলায় মুঘল শাসকদের আগ্রাসন শুরু হয়। মুঘলদের বিরুদ্ধে বাংলার ছোট ছোট ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ কখন ঐক্যবদ্ধ আবার কখন বা এককভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এসব প্রতিরোধ 'বারো ভূঁইয়া'দের প্রতিরোধ নামে ইতিহাসে খ্যাত। ঈসা খান এবং মুসা খান ছিলেন বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। মুঘলদের সাথে বারো ভূঁইয়াদের যে লড়াই সেখানেও কিন্তু বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের তেমন কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। এসবই ছিল নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তারে ব্যতিব্যস্ত অভিজাত ক্ষমতাবান শ্রেণির নিজেদের লড়াই। ধর্ম বা ভাষা এক হলেও তারা এই লড়াই চালাতেন। সম্পদ এবং জমির মালিকানা দখলে নেওয়াই ছিল তাদের কাছে মুখ্য। জল ও জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত ভূমি দান করার মাধ্যমে আবাদযোগ্য করা এবং সেখান থেকে খাজনা আদায় করাই ছিল বাংলা অঞ্চলে মুঘল শাসকদের রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ। প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা ও শস্য আদায় করে মুঘল শাসকরা বিলাসী জীবন যাপন করতেন। তাদের এই তৎপরতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল স্থানীয় ক্ষমতাবান জমিদার বা বারো ভূঁইয়ারা। এই দুই পক্ষের লড়াই ছিল কারো জন্যে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর কারো জন্যে ক্ষমতা দখলে নেওয়ার প্রয়াস। বলা যায়, এই লড়াই ছিল মূলত সাধারণ মানুষের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অধিকার নিয়ে চলমান দুটি অভিজাত পক্ষের যুদ্ধ। খুশি আপা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে গোটা ভারতে মুঘল এবং আফগান মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের যে লড়াই চলমান ছিল,

১৫৭৬ সালে বাংলার সীমান্তে পরিচালিত রাজমহলের যুদ্ধ তারই অংশ। এই যুদ্ধের পরপরই বাংলা অঞ্চল মুঘলদের অধীনস্থ হয়। বাংলার নাম দেওয়া হয় 'সুবাহ বাংলা'। এ-সম্পর্কে বড় হয়ে তোমরা আরো বিস্তারিত জানতে পারবে।

ব্রিটিশ শাসনে বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ

খুশি আপা এবার শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে খুব সহজভাবে বাংলা অঞ্চলে ইংরেজদের আগমন এবং শোষণের ইতিহাস তুলে ধরতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথমবার ব্যাপকভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল মূলত ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হবার পর। কেননা এই সময় কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রামের প্রত্যন্ত অংশে প্রবেশ করেছিল। বহু দূরের ভূ-খণ্ড থেকে আগত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী গরিব কৃষকদের জোর করে ভূমিতে নীলসহ অন্যান্য কৃষি দ্রব্যাদি চাষে বাধ্য করত এবং একই সাথে তাদের ওপর প্রয়োগ করত নানা ধরনের পীড়নমূলক নীতি। এর ফলে দেখা দেয় নানা ধরনের বিদ্রোহ। নীল বিদ্রোহের পাশাপাশি টঙ্ক, নানকার, স্বদেশি, সাঁওতাল বিদ্রোহ, অসহযোগ আন্দোলনসহ নানা ধরনের আন্দোলন ক্রমেই দানা বেঁধে ওঠে। আর এসব আন্দোলনে সাধারণ মানুষ ও কৃষককুল ব্যাপকভাবে অংশ নিতে শুরু করে। বাংলা অঞ্চলের মেয়েরাও বিপ্লব এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয়। ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করার আন্দোলনে যোগ দিয়ে শহীদ হন বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এছাড়া বিপ্লবী ইলামিত্রসহ অনেকেই নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হন। বাংলা অঞ্চলের মতো গোটা ভারতবর্ষেই এই ধরনের আন্দোলন চলতে থাকে। সাধারণ সহযোজি মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুখে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

যুক্তিবাদী সমাজ ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথে বাংলা

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনামলে ভারত তথা বাংলা অঞ্চলের মানুষজন পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগে পরিচিত হয়। এর বহুবিচিত্র প্রভাব পড়েছিল এতদঞ্চলের ইতিহাসে। বাংলা অঞ্চলসহ ভারতীয় উপমহাদেশে সংস্কারমুক্ত একদল মানুষের উত্থান ঘটে, যারা হাজার বছর ধরে চলমান ধর্ম-সামাজিক গোঁড়ামিকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির পথ তৈরিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। এই তালিকায় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্ত করা, পর্দা বা অবরোধ প্রথার শৃঙ্খল থেকে নারীদের মুক্ত করে শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসার জন্যে তারা আমৃত্যু সংস্কার আন্দোলন এবং লেখালেখি করেছেন। ইংরেজ সরকারের গভর্নরদের মধ্যেও অনেকেই ছিলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তি, বাল্যবিয়ে বন্ধ এবং বিধবা বিয়ে চালু করার মতো জরুরি বিষয় আইন করে এখানে বাস্তবায়নের প্রয়াস চালানো হয় সেই সময়ে। গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যে ইউরোপ থেকে আগত অনেকেই তখন কখনও শিক্ষকতায় যুক্ত থেকে, সংগঠন করে, কখনও আবার পত্রিকায় লেখালেখি করে সক্রিয় তৎপরতা চালিয়েছেন। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন এমনই একজন ইউরোপীয় কবি, যুক্তিবাদী চিন্তক ও দার্শনিক। কলকাতার হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্য এবং ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন ডিরোজিও। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদান শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন সংগঠন করে, পত্রিকা খুলে তিনি দর্শন ও যুক্তির শিক্ষা প্রসারে মনোযোগী হয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোতে বিদ্যমান গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও অন্ধত্বের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর শিক্ষার্থী ও অনুসারীদের সচেতন করে তোলেন। এর ফলে গোঁড়া ধার্মিক ও মৌলবাদীদের শত্রুতে পরিণত হন ডিরোজিও। তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্তও করা হয়। কিন্তু তাতেও তিনি

দমে যাননি। ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যরা মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে সত্য গ্রহণের পক্ষে যে আন্দোলনের সূচনা করেন তার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধত্বকে সজোরে আঘাত করে জ্ঞান জগতে নতুন এক জাগরণের সূচনা হয়েছিল এসব মানুষের হাত ধরে। তরুণদের হাতে গড়ে ওঠা ও পরিচালিত এই ঘটনা ইতিহাসে 'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলন নামে পরিচিত। এ বিষয়েও তোমরা পরবর্তী শ্রেণিতে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে।

বাংলা ভাগ ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ

উপমহাদেশের মানুষ জ্ঞান চর্চায় যতবেশি সচেতন হচ্ছিল, ইংরেজবিরোধী আন্দোলনও তত প্রবল হচ্ছিল। মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার চর্চা এবং ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবেসে তাদের সামগ্রিক মুক্তির জন্যে তখনো কোনো একক গ্রহণযোগ্য নেতাকে বাংলা ভূখণ্ডে দেখা যায়নি। ২০ শতকের প্রথম ভাগে তেমনই একজন নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। তিনি বাংলার মানুষের মুক্তির জন্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ক্ষমতায় তখন অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ শক্তি এবং ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগসহ অন্যান্য দল। ধর্মকে ব্যবহার করে ব্রিটিশ, ভারতীয় এবং বাঙালি অভিজাত রাজনীতিবিদদের রাজনীতি তখন তুঙ্গে। এরই মধ্যে যুক্ত বাংলা বা অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও চলছিল। ১৯০৫ এবং ১৯৪৭ সালে দুইবার বাংলা ভাগ করা হয় যা 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে বাংলার পূর্ব অংশকে জুড়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সংগে ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং পূর্ব অংশে মুসলমান বেশি এই যুক্তিতে। অথচ ১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে তখনও প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি মানুষ ছিল ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম-সাংস্কৃতিক রীতি-নীতিতে বিশ্বাসী। তরুণ বঙ্গবন্ধু এ সময় মুসলিম লীগের রাজনীতি ধারণ করলেও তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং সকল মানুষের নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বাংলা অঞ্চলকে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করে এর পূর্ব অংশকে পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দেবার রাজনীতি সমর্থন করলেও বঙ্গবন্ধু কখন মানুষের মধ্যে ধর্মের নামে বিভেদ চাইতেন না। সকল মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাই ছিল তাঁর কাছে প্রথম ও শেষ কথা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, একে ফজলুল হক এবং মাওলানা ভাসানীর মতো রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলন করে গেছেন। বাংলার পূর্ব অংশের সাধারণ মানুষের ওপর পাকিস্তানের মুসলমান শাসকদের শোষণ ও আধিপত্য তিনি মেনে নেননি।

ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধু মানুষের মুক্তির আন্দোলন করেছেন। শোষণ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে বারবার জেল খেটেছেন, সাধারণ মানুষকে পাকিস্তানি শাসকদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জীবন বাজি রেখে কাজ করেছেন। বাংলা অঞ্চলের মাটি-কাদা-পানির বাস্তবতা এবং জন মানুষের মধ্য থেকে উঠে আসা একজন মানবতাবাদী নেতা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু জানতেন, এই অঞ্চলের মানুষকে উন্নততর ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির নামে বহু দূরদেশ থেকে আগত উচ্চাভিলাষী তথাকথিত অভিজাত শ্রেণি হাজার বছর ধরে শাসন ও শোষণ করে চলেছে। কখন ধর্মের নামে, রাজবংশের নামে, সম্পদ দখল করার অভিপ্রায়ে, ক্ষমতার মসনদ পাওয়ার লোভে চলেছে এই শোষণ। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মধ্যে যারা ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ধর্ম, বংশ, জাত, নির্বিশেষে সকল পরিচয়ের বিভেদ পেছনে ফেলে কেবল মানুষ পরিচয়কে সামনে রেখে যে

ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রমাণ বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন ইতিহাসে তা দৃষ্টান্তমূলক। তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম ও ত্যাগের পথ পেরিয়ে ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঘটে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা। প্রতিটি শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সংগ্রাম বিষয়ে তোমরা আরো গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য জানতে পারবে।

হাজার বছরের ইতিহাসে তোমরা দেখেছ, এই অঞ্চলের মানুষ কত বিচিত্র ধরনের বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। কখন প্রাকৃতিক আবার কখন মনুষ্য-সৃষ্ট প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে গেছে। বাংলা ভূ-খন্ডের মানুষ বরাবরই শান্তিপ্রিয়, অসাম্প্রদায়িক। সবাই মিলেমিশে এবং বিপদে-আপদে পাশে থেকে বাস করার প্রবণতাই বাংলার ইতিহাসের চালিকাশক্তি। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য মানুষের আচার-আচরণে, খাদ্যাভাসে, চিন্তা-চেতনায়, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে স্বকীয়তা তৈরি করেছে। পানির প্রচুরতা ও বৃষ্টি, সেচ ও কৃষিকে একদিকে যেমন করেছে সহজ, তেমনি আবার করেছে কঠিন। অঞ্চলটি খাদ্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ থাকায় দূর-দূরান্তের ভূ-খন্ড থেকে আগত মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। এখানকার আদি অধিবাসীদের সংগে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছে। আবার হয়েছে ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়। বাংলা তথা ভারতের ভৌগোলিক ভূ-খন্ডের বহু দূরবর্তী স্থান হতে আগত ক্ষমতালোভী অনেকেই এখানে রাজক্ষমতা সম্প্রসারনণের চেষ্টা করেছে। উচ্চাভিলাষী অভিজাত শ্রেণি নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষ, যারা ঐক্যবদ্ধভাবে কতিপয় তথাকথিত এলিট স্বার্থান্বেষী রাজশক্তিকে পরাজিত করে নিজেদের শাসনক্ষমতা আদায় করতে পারেননি। বাংলা অঞ্চল বরাবরই শাসিত হয়েছে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে থেকে আগত শাসকবর্গের হাতে। হাজার বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম বাংলার কাদামাটি, নদী আর সবুজ অরণ্য থেকে উঠে এসে সাধারণ মানুষের জন্যে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নির্মাণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে সবার কাছে স্বীকৃত। তবে তোমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি কেবল বাঙালির মুক্তির জন্যে লড়াই করেন নি, কোনো বিশেষ ধর্ম বা বর্ণ বা গোষ্ঠীর মানুষের জন্যেও লড়াই করেন নি। ধর্ম, বর্ণ, জাত, গোত্রের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে তিনি এই ভূমির সকল মানুষের জন্য, মানবতার ধর্মে আস্থা রেখে, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষকে সাথে নিয়ে তাদের মুক্তির আন্দোলন করেছেন। এজন্যেই 'বঙ্গবন্ধু'কে মানবতাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে 'বিশ্ববন্ধু' অভিধায়ও সম্মানিত করা হয়েছে। বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি' পদকপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৩ সালের ২৩ মে পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল এই অভিধায় ভূষিত করেন।

যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কীভাবে

আমাদের প্রথম পড়া দাঁতটি আমরা কী করেছি?

রুপা আজ ক্লাসে এসেছে কাগজে মোড়ানো একদম ছোট্ট একটা কিছু নিয়ে। সবাই বলল, “কী এর ভেতরে? খুলে দেখাও। ” রুপা মোড়ানো কাগজ খুলতেই বেরিয়ে এলো সাদা ছোট্ট একটি দাঁত। রুপা বলল, “আমার ছোট বোনের দাঁত পড়েছে। এটি সে ঘুমানোর সময় তার বালিশের নিচে রেখেছে। সে ভাবছে একটি পরি এসে তার দাঁত নিয়ে যাবে আর তাকে একটি উপহার দিয়ে যাবে। এটি সে বিদেশি কার্টুনে দেখেছে”। আনুচিং বলল, “আসলেই কি পরি আসবে?” রুপা বলল, “আরে না, আমার মা-ই উপহার কিনে বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে। ” সবাই হেসে উঠল।

এবারে ক্লাসের সবাই তাদের প্রথম পড়া দাঁতটি কী করেছিল তা বন্ধুদের বলল। তুমি তোমার প্রথম পড়া দাঁতটি কী করেছিলে? ছবি এঁকে তোমার বন্ধুদের সেই গল্পটি বলতে পারো।

আমার প্রথম পড়া দাঁতটির গল্প

ছবিসহ আমার প্রথম পড়া দাঁতটির গল্প লিখি	
আমার প্রথম পড়া দাঁতটি আমি ...	ছবি আঁকি ...

খুশি আপা ক্লাসে ঢুকতেই সবার প্রশ্ন- "আপা, সত্যিই কি দাঁত নেওয়ার জন্য পরী আসে? আপা, ইঁদুর এসে কি সত্যিই আমাদের দাঁত নিতে পারে?"

খুশি আপা বলল, "তোমাদের কী মনে হয়? চলো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজি। সাথে এই দাঁত পড়া নিয়ে বাড়িতে, এলাকায়, বন্ধু, প্রতিবেশী, আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কী কী গল্প, কথা, প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে তাও জানার চেষ্টা করি। চলো নিচের সারণি থেকে একনজরে অনুসন্ধানের ধাপগুলো দেখে নিই।

একনজরে অনুসন্ধানের ধাপ

ধাপ	ধাপটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	উদাহরণ
অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু (Topic) নির্ধারণ করা	যে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হবে	যেমন- "আমাদের এলাকায় পরিবর্তন" 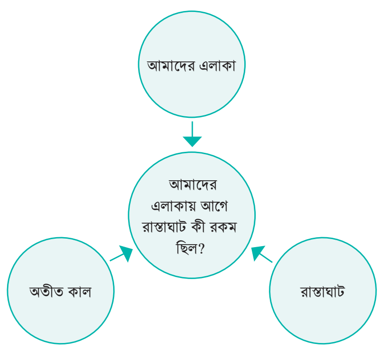

অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন (Inquiry Question) উত্থাপন করা	আগের ধাপে নির্ধারিত বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন আমরা চিন্তা করে লিখব বা তৈরি করব। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই আমরা অনুসন্ধানী ধাপগুলোর মাধ্যমে খুঁজে বের করব।	যেমন- "আমাদের এলাকায় পরিবর্তন" বিষয়ের জন্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন হতে পারে: প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তাঘাট কী রকম ছিল? প্রশ্ন-২ আগে আমাদের এলাকার মানুষের কী কী পেশা ছিল? প্রশ্ন-৩ আগে এলাকায় কী কী উৎসব পালন হতো?
প্রশ্ন থেকে মূল ধারণা (key concept) খুঁজে বের করা	প্রতিটি অনুসন্ধানের প্রশ্নের মধ্যে এক বা একাধিক মূল ধারণা রয়েছে। সেগুলো চিহ্নিত করতে পারলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কোথা থেকে আর কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার।	যেমন- প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তাঘাট কী রকম ছিল? এই প্রশ্নে তিনটি মূল ধারণা রয়েছে:
তথ্যের উৎস (Data Source) নির্বাচন করা	যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি সেটি জানার জন্য কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে? যেমন- হতে পারে কোনো জাদুঘর বা সংগ্রহশালা, কোনো বই বা ম্যাগাজিন, কোনো মানুষ যে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানেন, কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, ইন্টারনেট, ভিডিও ইত্যাদি।	যেমন- প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তাঘাট কী রকম ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমরা এলাকার বয়োজেষ্ঠ্য মানুষের কাছে যেতে পারি, আগের কোনো মানচিত্র দেখতে পারি, বা এ বিষয়ে কোনো লেখা পড়তে পারি। এগুলো আমাদের তথ্য উৎস।
তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Data collection method) নির্ধারণ	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হলো যে উপায়ে আমরা তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করব- যেমন- প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি।	প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তাঘাট কী রকম ছিল? এর জন্য আমরা এলাকার বয়োজেষ্ঠ্য মানুষদের একসাথে করে দলীয় আলোচনা করতে পারি। তাদের আলোচনা থেকে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারি। অথবা প্রত্যেকের সাক্ষাৎকার নিতে পারি।
তথ্য সংগ্রহ করা (Data Collection)	এই ধাপে নির্বাচিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত মানুষের কাছ থেকে বা স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।	যেমন- প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তাঘাট কী রকম ছিল? এটি জানার জন্য আমরা ৪/৫ জন বয়সে বড় এমন মানুষ, অর্থাৎ বয়োজেষ্ঠ্য মানুষ নির্বাচন করে তাদের কাছে গিয়ে তাদের অনুমতি নিয়ে তাদের সাথে দলীয় আলোচনা করতে পারি। তাদের দেওয়া উত্তরগুলো লিখে রাখব অথবা রেকর্ডও করতে পারি।

তথ্য বিশ্লেষণ করা (Data Analysis)	আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করি সেগুলো থেকে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। সেগুলো পড়তে হয়, সাজাতে হয়, অথবা কিছু হিসাব নিকাশ করতে হয়। এর ফলে তথ্য হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ। এই প্রক্রিয়াকে বলে তথ্য বিশ্লেষণ।	সংগ্রহ করা তথ্য ব্যবহার করে আমরা আগের সময়ের রাস্তাঘাট চিহ্নিত করে একটি মানচিত্র তৈরি করতে পারি। আবার ৩ জনের তথ্য কে একত্রিত করে এলাকার প্রধান প্রধান সড়কপথগুলো সম্পর্কে বর্ণনা লিখতে পারি।
ফলাফল বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Results/ Findings)	তথ্য বিশ্লেষণের পর আমরা আমাদের অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই। এটিই আমাদের ফলাফল। অর্থাৎ আমরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম।	যেমন- ওপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে আমাদের ফলাফল হতে পারে: আগে আমাদের এলাকায় উত্তর পশ্চিম পাশে কোনো সড়ক ছিল না। এখন সেখানে অনেক বড় একটা সড়ক তৈরি হয়েছে। এর ফলে এখন উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে যাতায়াত সহজ হয়েছে। তবে আগে অনেক ছোট ছোট মেঠো পথ ছিল। এখন সেগুলো নেই। মানুষ এখন পায়ে হেঁটে চলাচল কম করে।
ফলাফলটি অন্যদের কাছে উপস্থাপন বা শেয়ার করা (Communicating the result)	নানা উপায়ে আমরা আমদের অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় পাওয়া ফলাফল অন্যদের সামনে তুলে ধরতে পারি। যেমন- গ্রাফ, সারণি, ছবি, ভিডিও, লিখিত প্রতিবেদন, নাটক ইত্যাদি।	যেমন ওপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে:

দাঁত পড়া নিয়ে মজার মজার রীতি-নীতি অনুসন্ধান

আজ সবাই দলে ভাগ হয়ে দাঁত পড়া নিয়ে মজার মজার রীতি-নীতি অনুসন্ধান করবে। রূপা বলল, "সব পরিবারেই একই রীতি-নীতি। দাঁত বালিশের নিচে রেখে পরীর জন্য অপেক্ষা করা"। সাব্বির বলল, "আহা রূপা অনুসন্ধানের ফলাফল আগেই কি অনুমান করা যায়?" রূপা বলল, "কিন্তু আমার মাথায় এই চিন্তাটি এলো, তাই বললাম"। আনুচিং বলল, আচ্ছা ঠিক আছে ,ঠিক আছে, থামো। আমরা বরং অনুসন্ধানে নেমে পরি। অনুসন্ধান শেষেই বোঝা যাবে রূপার অনুমান কি সঠিক ছিল কি না"।

অনুসন্ধানী কাজ-১

বিষয়বস্তু: দাঁত পড়া নিয়ে রীতি-নীতি

অনুসন্ধানের প্রশ্ন:- দাঁত পড়া নিয়ে আমাদের পরিবার বা এলাকা বা সমাজে কী ধরনের রীতি-নীতি আর গল্প প্রচলিত আছে?

প্রশ্নে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে:-

- আমাদের পরিবার, এলাকা ও সমাজ
- প্রথম দাঁত পড়লে রীতি-নীতি বা নিয়ম-কানুন
- দাঁত নিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প বা চিন্তা-ভাবনা

কার কাছে বা কোথায় গেলে জানতে পারব? (তথ্যের উৎস):

কী উপায়ে জানবো ও তথ্য সংগ্রহ করব? (তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি):

তথ্য সংগ্রহ: এ জন্য আমরা নিচে দেওয়া ছকটি ব্যবহার করতে পারি। দলের সবাই মিলে বিভিন্ন এলাকার ও বিভিন্ন সময়ের মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করল।

তথ্য বিশ্লেষণ: একই রকম তথ্যগুলোকে একসাথে করল, যেমন- এলাকাভিত্তিক তথ্য, বিভিন্ন সময়ের তথ্য (বিভিন্ন বয়সী মানুষের কাছ থেকে নেওয়া)।

ফলাফল বা সিদ্ধান্ত:

উপস্থাপন: রবিন আর তার দল তাদের অনুসন্ধানী কাজ ও তার ফলাফল ছবি এঁকে উপস্থাপন করল- কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন এলাকার মানুষ প্রথম দাঁত পড়লে কী কী করে। ভিন্ন এলাকার দাঁত নিয়ে মজার মজার গল্প বলল। অন্যরাও নানা উপায়ে উপস্থাপন করল তাদের অনুসন্ধানী কাজ।

তথ্য সংগ্রহের ছক:

কার কাছ থেকে তথ্য নিলাম?	প্রথম দাঁত পড়লে কী করে?	দাঁত নিয়ে মজার কোনো চিন্তা/প্রচলিত গল্প
সাবিহা খাতুন (ফাতেমার দাদি), রাজশাহী		

সবার উপস্থাপনা শেষে রূপা বলল, "নাহ, যা ভেবেছিলাম তা ঠিক না। আমার অনুমানটি সঠিক নয়। দাঁত পড়ার রীতি-নীতি সব এলাকা বা সমাজে একই নয়, ভিন্ন ভিন্ন। " সাব্বির বলল, "অনেক বিষয়েই আমাদের এ রকম কিছু অনুমান থাকে, এগুলো আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা বা চিন্তা। অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে আমরা সেটি যাচাই করতে পারি, আমাদের ধারণাও পাল্টাতে পারি"।

বন্ধুর দলের কাজের মূল্যায়ন করি

বন্ধুদের উপস্থাপনা মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। নিচের ছকে অনুসন্ধানের প্রতি ধাপে অনুসন্ধানকারীর কাছ থেকে যে প্রত্যাশা বা আদর্শ কাজ তা দেওয়া আছে। সেগুলো বিবেচনা করে প্রতি দলের অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে কীভাবে আরও উন্নয়ন করা যায়, কী করলে বা না করলে আরও ভালো হতো এবং কেন, এগুলো বুঝিয়ে বলি, আর খুব ছোট ও সংক্ষেপ করে নিচের চার্টে লিখি। বন্ধুদের ভালো কাজের প্রশংসা করতেও ভুলবোনা আমরা। এঁকে বলে ফিডব্যাক (Feedback) দেওয়া। প্রতি ধাপে তাদের কাজটি সঠিকভাবে করতে পেরেছে/আংশিক পেরেছে/আর অনেক সাহায্যের দরকার- এই ৩টির কোনো একটি লিখব তাদের কাজটি আদর্শের সাথে তুলনা করে।

আদর্শ/ প্রত্যাশা	অনুসন্ধানের প্রশ্ন (প্রশ্নটি বা প্রশ্নগুলো সুনির্দিষ্ট, আকর্ষণীয় ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সমাধান যোগ্য)	প্রশ্নের মূল বিষয়বস্তু (প্রশ্নে যে মূল বিষয় আছে সেগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছে)	তথ্য উৎস (প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত তথ্য উৎস উল্লেখ করতে পেরেছে)	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করতে পেরেছে)	তথ্য সংগ্রহ (পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে ও রেকর্ড করতে পেরেছে)	তথ্য বিশ্লেষণ (সঠিক উপায়ে তথ্য সাজিয়ে/ হিসাব নিকাশ করে অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর/ সমাধানে পৌঁছতে পেরেছে)	ফলাফল উপস্থাপন (স্পষ্টভাবে ও আকর্ষণীয় উপায়ে অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া আর ফলাফল উপস্থাপন করেছে)	মন্তব্য/ ফিডব্যাক
দল-১								
দল-২								
দল-৩								
দল-৪								
দল-৫								

নিজ দলের সদস্যদের মূল্যায়ন

পুরোপুরি করেছে, কিছুটা করেছে, আরও অনেক উন্নতি করতে হবে- এই কথাগুলো ব্যবহার করে ফিডব্যাক দিতে পারি আমরা আমাদের নিজ দলের বন্ধুদের।

দলের সদস্যদের নাম	আংশগ্রহণ (পুরো অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে)	অন্য সদস্যদের সাহায্য করা (যখন যেই সদস্যর সাহায্য প্রয়োজন, নিজেই আগ্রহ নিয়ে সাহায্য করেছে)	অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা (সব সময় বন্ধুদের মতামত শ্রদ্ধা করেছে, নিজের মতের সাথে না মিললেও)	মতামত বা ফিডব্যাক
আনাই				
সুমন				
রূপা				
ফাতেমা				

ব্যক্তিগত ধারণা ও তার যাচাই: যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো

আনুচিং আজ ক্লাসে এসে বলল, “খুশি আপা, কাল রূপা যা অনুমান করেছিল তাকে বলে হাইপথেসিস বা পূর্বের অনুমান, আমি বইয়ে পড়েছি”। রূপা বলল, “কী? হিপোপটেমাস না কি বললে এটা তুমি?” সবাই হেসে উঠল। খুশি আপা বললেন, “তাহলে আজ আনুচিং এ বিষয়ে একটা ছোট্ট ক্লাস পরিচালনা করুক। আনুচিং যা বলল তার সারমর্ম এ রকম:

পূর্বানুমান বা অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis):

অনেক সময় আমরা আমাদের অনুসন্ধানী কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহের আগেই আমাদের এই অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে একটা অনুমান করি। একে বলে পূর্বানুমান বা অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)। সাধারণত আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা বা সাধারণ বুদ্ধি (Common sense) থেকে আমরা এ রকমটি মনে করে থাকি। আমাদের এই অনুমান ভুল বা সঠিক হতে পারে। আমরা অনুসন্ধনের জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করি তার বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারি আমাদের এই পূর্বানুমান সঠিক নাকি ভুল ছিল। তখন আমরা প্রয়োজনে আমাদের ধারণাটি শুধরে নিই। এভাবেই আমরা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি। তাহলে কেউ আমার ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুললে সেটি যে ব্যক্তিগত ধারণা নয় বরং বৈজ্ঞানিক ধাপ অনুসরণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে তা আমরা বুঝিয়ে বলতে পারব।

এসো আমরা আনুচিং এর কথা থেকে ব্যক্তিগত ধারণা আর যৌক্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করি:

ব্যক্তিগত ধারণা বা অনুমান	যৌক্তিক সিদ্ধান্ত

এখন খুশি আপার ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা তাদের বিভিন্ন অনুমান বা ব্যক্তিগত ধারণাকে যখনই সম্ভব অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে যাচাই করে নেয়। তোমরাও তা করতে পার। নিচে রবিনের করা একটি উদাহরণ দেখতে পার।

বিষয়বস্তু	আগের ধারণা বা অনুমান	অনুসন্ধানী কাজের বর্ণনা	পরের ধারণা বা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত
আমাদের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পরিবারের ধরন।	বেশির ভাগ শিক্ষার্থী একক পরিবারে বাস করছে।	ক্লাসের সবার কাছ থেকে তাদের পরিবারের সদস্য সম্পর্কে তথ্য নিলাম।	বেশির ভাগ শিক্ষার্থী একক পরিবারে বাস করছে (৭৫%)। এ ক্ষেত্রে অনুমিত সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল।

অনুসন্ধানী ধাপগুলোর বিশ্লেষণ বা প্রতিফলন:

নীলা আর গণেশ ক্লাসে তার নিজের তৈরি প্রতিফলন ডায়েরি নিয়ে এসেছে। প্রতিফলন মানে নিজের কাজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা। তারা দেখাল কী কী লিখেছে তারা সেই ডায়েরিতে। চাইলে তোমরাও এ রকম বানাতে পার। তাদের ডায়েরির একটি অংশ দেখো। এভাবে তারা প্রতি ধাপ নিয়েই লিখেছে...

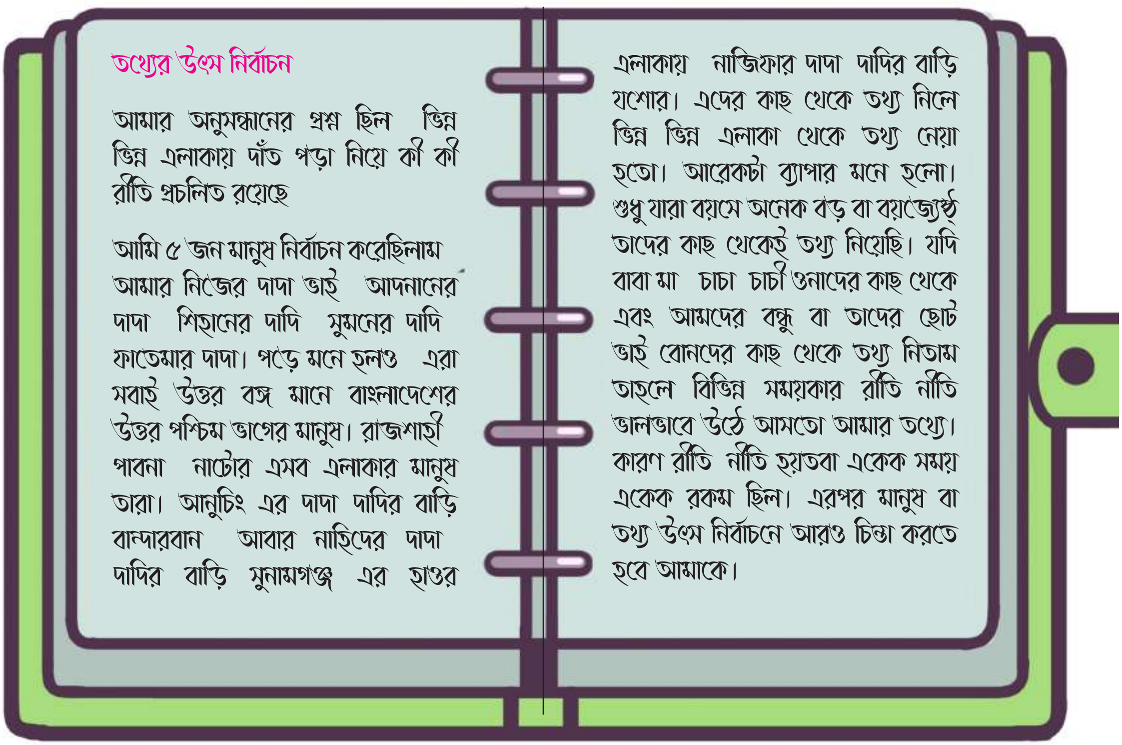

নীলার অনুসন্ধানী কাজের প্রতিফলনের ডায়েরি

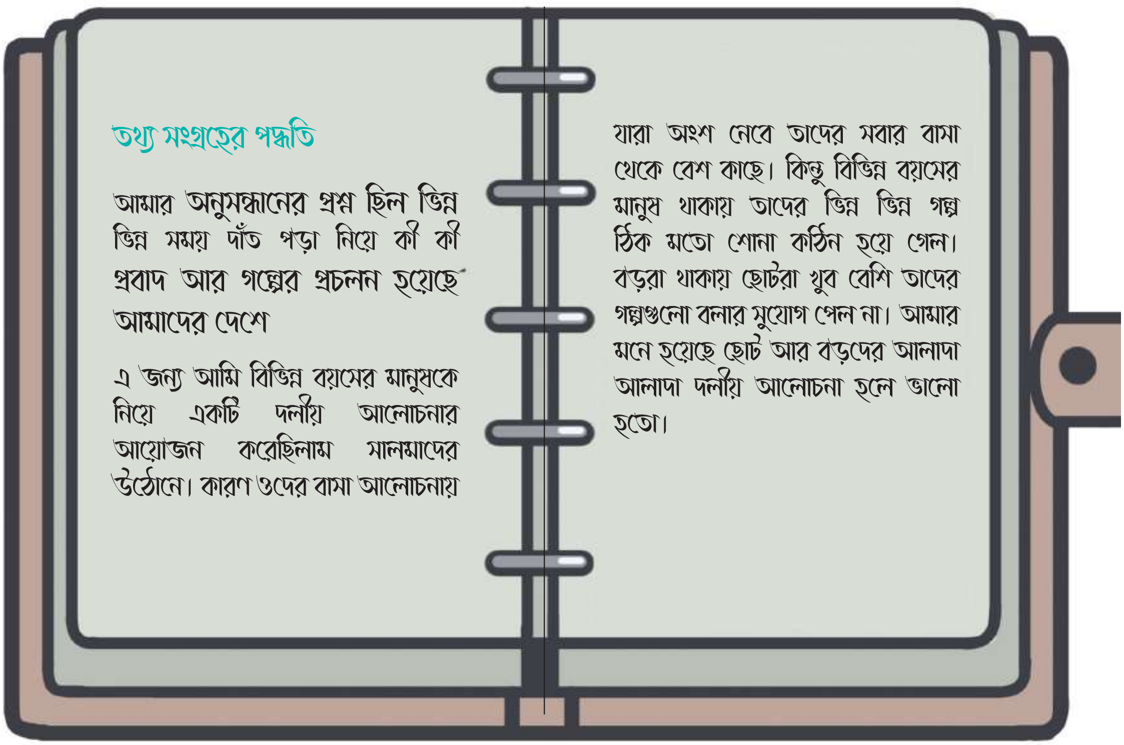

গণেশের অনুসন্ধানী কাজের প্রতিফলনের ডায়েরি

তোমাদের প্রতিটি অনুসন্ধানী কাজের সময় ধাপগুলোতে প্রতিফলন করে তা লিখবে। বছর শেষে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে তোমরা অনুসন্ধানী ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করবে।

অন্য দেশের শিশুরা দাঁত পড়লে কী করে সেই দাঁত?

আজ ক্লাসে খুশি আপা বললেন, “আচ্ছা, আমাদের দেশে তো দেখলাম দাঁত পড়লে আমরা কী কী করি। তোমাদের কী মনে হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাচ্চাদের যখন দাঁত পড়ে যায় তখন তারা কী করে সেই দাঁত? আমাদের মতোই, নাকি ভিন্ন কিছু করে?”

সুমন বলল, “মনে হয় এগুলোই করে। ”

সাদিয়া বলল, “বাংলাদেশ থেকে আফ্রিকা মহাদেশ কত দূরে! সেই মহাদেশের মানুষরা ভিন্ন কিছুও করতে পারে। ” মুনিয়া কাগজ দিয়ে চোঙ্গার মতো মাইক বানিয়ে ঘোষণা দিল, “বন্ধুরা এসবই তোমাদের ...” সবাই চিৎকার করে বলে উঠল “হাইপোথিসিস”। “এগুলো যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমাদের লাগবে...” সবাই কথা শেষ হবার আগেই বলল- “অনুসন্ধান”।

খুশি আপা এবার কয়েকটি দেশে দাঁত পড়লে কী করার রীতি তা বললেন:

মিশর (Egypt) এর কথা মনে আছে? বলো তো মিশর কিসের জন্য বিখ্যাত? মিশরের শিশুরা তাদের প্রথম পড়ে যাওয়া দাঁতগুলো ছুড়ে দেয় সূর্যের দিকে আর সূর্য মামাকে বলে উজ্জ্বল সাদা নতুন দাঁত দিতে তাদের।

আনাই বলল, "আর কোন কোন দেশের বাচ্চারা কী কী করে দাঁত নিয়ে। " খুশি আপা বললেন, "তোমরাই খুঁজে বের কর না। বিদেশে থাকা আত্মীয়, বন্ধু, ইন্টারনেট, বই, পত্রিকা খুঁজে দেখো। "

অনুসন্ধানী কাজ-২

বিষয়বস্তু: বিভিন্ন দেশের দাঁত পড়া নিয়ে প্রচলিত রীতি-নীতি ও গল্প

অনুসন্ধানের প্রশ্ন:- বিভিন্ন দেশে শিশুদের প্রথম দাঁত পড়লে তারা কী করে?

বিভিন্ন দেশে দাঁত পড়া নিয়ে কী কী গল্প প্রচলিত আছে?

প্রশ্নে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে:-

- তথ্য উৎস:
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:
- তথ্য সংগ্রহ: এ জন্য আমরা নিচে দেওয়া ছকটি ব্যবহার করতে পারি
- তথ্য বিশ্লেষণ:
- ফলাফল বা সিদ্ধান্ত:
- উপস্থাপন:

মহাদেশ/দেশ/এলাকার নাম	দাঁত পড়লে রীতি-নীতি	রীতি-নীতি সংক্রান্ত ধারণা
১/মিশর ও অন্যান্য কিছু মধ্যপ্রাচ্যের দেশ	শিশুরা সজোরে দাঁত সূর্যের দিকে ছুড়ে দেয়	সূর্যের মতো উজ্জ্বল সাদা দাঁত উঠবে
২/অস্ট্রেলিয়া		
৩/ভারত		
৪/তাজিকিস্তান		

একটি এলাকার একাধিক রীতি-নীতিও থাকতে পারে।

সবাই অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে প্রশ্নের উত্তর খুঁজল। এবার তারা নানা উপায়ে তাদের এই তথ্য উপস্থাপন করল। সাদিয়াদের দল তো একটি মজার গান বানালো আর গেয়ে শোনাল বিভিন্ন দেশের নাম ও তাদের দাঁত সংক্রান্ত রীতি-নীতি। তোমরাও নানা উপায়ে তোমাদের ফলাফল উপস্থাপন করতে পার।

দুধদাঁত পড়ে

কেউ ছুড়ে দেয় দাঁতটি নিজের ইঁদুর ভায়ার গর্তে,
বিনিময়ে ছোট্ট নতুন দাঁতকে পাবার শর্তে,
কেউবা আবার দাঁতখানিকে বাড়ির ছাদে রাখে,
টিকটিকিতে দাঁতটি নিয়ে নতুন দেবে তাকে।
কিন্তু যদি দাঁতটি তোমার বাতসকে দাও ছুড়ে,
দেখতে পাবে, একটি পাখি আসছে নিতে উড়ে।
সূর্যকে দেয় অনেক শিশু; উপায় আছে আরও

নতুন যে প্রশ্ন মাথায় এলো: কিছু কিছু এলাকায় আবার এই রীতি-নীতি গল্পগুলো একই কেনো? তোমাদের প্রশ্নগুলো প্রতিফলন ডায়েরিতে লিখে রেখো। এগুলো নিয়ে চিন্তা কর, অনুসন্ধান করো।

সমাজে প্রচলিত এসব নিয়ম-কানুন আসলে কী?

চিন্তা করি বন্ধুর সাথে জোড়া গঠন করি ভাবনার আদান-প্রদান করি

খুশি আপা বললেন, “এই যে নিজ দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন দাঁত পড়ার রীতি-নীতি নিয়ে অনুসন্ধান করলে, তোমাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন আছে?” ওমা! সবার কত কত প্রশ্ন:-

- বিভিন্ন এলাকায় দাঁত পড়ার পর প্রচলিত যেই কাজগুলো, এগুলোকে কী বলে? এগুলোর কোনো নাম আছে?

- দাঁত পড়া ছাড়া অন্য বিষয়ে কি এ রকম প্রচলিত নিয়ম-কানুন আছে? থাকলে কী কী বিষয়ে আছে?
- এসব নিয়ম-কানুন কেন ও কীভাবে একটি এলাকায় তৈরি হয়?
- এসব নিয়ম-কানুনগুলো কি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়?

তোমরাও চিন্তা করে দেখো তোমাদের আরও কোনো প্রশ্ন আছে কি না এই সংক্রান্ত।

দীর্ঘদিন ধরে কোনো এলাকার মানুষ বা কোনো সমাজের মানুষ যে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ মেনে চলে তাকে আমরা বলি প্রচলিত রীতি-নীতি। এগুলোর পিছনে প্রায়ই সেই এলাকার ও সেই সময়ের মানুষের বিভিন্ন বিশ্বাস জড়িত থাকে।

বিভিন্ন প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসন্ধান

দাঁত পড়া নিয়ে আমরা বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসন্ধান করেছি। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও বিভিন্ন সমাজে নানা ধরনের রীতি-নীতি প্রচলিত আছে। আমরা সেগুলোও অনসন্ধান করতে পারি। দেখতে পারি -কোনো একটি সময়কালে, নির্দিষ্ট সমাজে এগুলো কেন তৈরি হয়েছে? অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে আমরা প্রশ্ন তৈরি করি ও উত্তর খুঁজি। বয়সে যারা বড় তারা হয়তো এগুলো অনুসন্ধানে তথ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

অনুসন্ধানী কাজ-৩

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রীতি-নীতি

কিছু অনুসন্ধানের প্রশ্ন (উদাহরণ):

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করলে আমরা কেন দাঁড়াই?
- কবে থেকে এই প্রচলন এসেছে?
- কেন এই রীতির প্রচলন হলো?
- আর কোন কোন দেশে এ ধরনের প্রচলন আছে? কোন কোন দেশে নেই?

প্রশ্নে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে:-

- তথ্য উৎস:
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:
- তথ্য সংগ্রহ:
- তথ্য বিশ্লেষণ:
- ফলাফল বা সিদ্ধান্ত:
- উপস্থাপন:

সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি ও সামাজিক কাঠামো কি সময়ের সাথে সাথে বদলায়?

প্রাচীন কালের চীনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রচলিত গল্প থেকে জানা যায় যে চীনের কোন একটি এলাকায় একসময় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দিকে পিছন ফিরে বসে ক্লাস করতো। এখন আর করে না। আগের রীতিনীতি পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ, আগে তারা বিশ্বাস করতো শিক্ষকের মুখোমুখি হয়ে বসা বেয়াদবি। এখন সময়ের সাথে সাথে তাদের এ বিশ্বাসে পরিবর্তন হয়েছে, রীতিনীতিতেও পরিবর্তন এসেছে।

এসো খুশি আপার শিক্ষার্থীদের মতো আমরাও দলে ভাগ হয়ে নিজ বা অন্য সমাজের কোনো নির্দিষ্ট রীতি-নীতির বা অন্য কোনো সামাজিক কাঠামো যেমন- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইন, পরিবার ইত্যাদির পরিবর্তন অনুসন্ধান কৃত । আগের মতোই ধাপে ধাপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আগাও।

অনুসন্ধানী কাজ-৪

একটি অনুসন্ধানের প্রশ্ন নিয়ে অনুসন্ধান কাজ শুরু করি। এটি হতে পারে আমার নিজের সমাজের কোনো রীতি-নীতির পরিবর্তন অনুসন্ধান অথবা অন্য কোনো দেশ বা সমাজের।

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রীতি-নীতির পরিবর্তন

কিছু অনুসন্ধানের প্রশ্ন (উদাহরণ):

- আমার নিজ সমাজের ______________________ রীতি-নীতি কীভাবে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে?
- ______________________ সমাজের ______________________________ রীতি-নীতি সময়ের সাথে সাথে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?
- আমাদের এলাকার পেশার পরিবর্তন হয়েছে কীভাবে?
- বিভিন্ন সময় আমাদের রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয়েছে কীভাবে? (৬ষ্ঠ শ্রেণির অনুসন্ধানী পাঠ এর সাহায্য নিতে পারো)।
- বিভিন্ন সময় আমাদের সমাজে পরিবারের কাঠামোতে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

প্রশ্নে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে:-

১) তথ্য উৎস ২) তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ৩) তথ্য সংগ্রহ ৪) তথ্য বিশ্লেষণ ৫)ফলাফল/সিদ্ধান্ত: ৬)উপস্থাপন:

মিলির স্বপ্ন

কয়েক দিন ধরেই ক্লাসে খুব গন্ডগোল বেধে গেছে। ক্লাসের মধ্যে চলছে গুনগুন ফিসফিস। সবাইকে বেশ বিরক্ত মনে হয়। খুশি আপা আজ ক্লাসে ঢুকে বলল, "কি হয়েছে তোমাদের বলো তো?, সারা দিন তোমরা এত ঝগড়াঝাঁটি করছ, ক্লাসে সবাই মনে হচ্ছে এ ওর প্রতি রেগে আছ। তোমরাতো এ রকম কর না, মিলে মিশেই থাকো। কী হলো তোমাদের?" সবাই একসাথে হইচই করে উঠল।

আনাই বলল, "আপা, রূপা প্রতিদিন কারো না কারো জিনিস না বলে নিয়ে যাচ্ছে। আজ ও আমার টিফিন খেয়ে ফেলেছে"। গণেশ বলল, আমার স্কেল না বলে নিয়ে গেছে... "। আদনান বলল,, "আমার কলম নিয়ে গেছে"...... রূপা কিছুই বলে না চুপ করে থাকে।

নাজিফা বলল, "খুশি আপা, শিহান আজ আপনি ক্লাসে ঢুকেছেন সেটা দেখেও উঠে দাঁড়ায়নি"। নন্দিনী উত্তেজিত হয়ে বলল, "কোনো শিক্ষক এলে শিহান উঠে দাঁড়াচ্ছে না। "শিহান ফিক ফিক করে হাসে। সবাই খুবি রেগে যায় তার ওপর।

এবার গণেশ বলল, "আপা রনি, একটু আগে ক্লাসে ঘোষণা দিল যে আপনি নাকি আজ ক্লাস নিবেন না"। শিহান বলল, "আরে, রনি তো প্রতিদিনই সবাইকে নানা মিথ্যা কথা বলছে। রনি তার ঝাঁকরা চুল চুলকায় এমনভাবে যেন সে কিছুই করেনি।

এ রকম অভিযোগ নানাজনের বিরুদ্ধে চলতেই থাকে। খুশি আপা বললেন, "আচ্ছা চলো এক এক জন করে সবার ঘটনাগুলো দেখি। আপা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলো তো রনি কী করেছে? সবাই হই হই করে বলে উঠল, ও সারা দিন মিথ্যে কথা বলছে। আপা জিজ্ঞাসা করলেন, "তাতে কী হয়েছে?" সবাই তো খুশি আপার প্রশ্ন শুনে অবাক। সবাই বলল আপা মিথ্যা বলা খুবই খারাপ। আপা জিজ্ঞাসা করল, "কে বলেছে, কবে বলেছে মিথ্যা বলা খুবি খারাপ?" সবাই তো এবার ভাবলো খুশি আপা মনে হয় পাগল হয়ে গেছে। এগুলো কি প্রশ্ন! কিন্তু সবাই চিন্তায় পড়ল, আসলেই তো আমরা মিথ্যা কথা কেন পছন্দ করি না? মিথ্যা বলাকে কেন আমরা খারাপ মনে করি?

-------------------ধড় ফড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল মিলি। সে বলল, "উফ কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম"

পরদিন মিলি ক্লাসে তার মজার স্বপ্নটির কথা খুশি আপা আর তার বন্ধুদের বলল। খুশি আপা বললেন, স্বপ্নের খুশি আপার মতো আমারও কিছু প্রশ্ন আছে তোমাদের জন্য:

মুক্ত আলোচনা:

কেন আমরা মিথ্যা বলাকে খারাপ মনে করি?
মিথ্যা বলা খারাপ এটা আমরা কীভাবে, কার কাছ থেকে, কবে জানলাম?
এ রকম আর কী কী বিষয় আছে যেগুলো সাধারণত আমরা সবাই পছন্দ বা অপছন্দ করি?
এগুলোকে আমরা কী বলতে পারি?

যেসব বৈশিষ্ট্য আমরা সাধারণত পছন্দ করি	যেসব বৈশিষ্ট্য আমরা সাধারণত অপছন্দ করি
১। সত্য কথা বলা	১। বড়দের অসম্মান করা
২। সময়ানুবর্তীতা	

নন্দিনী বলল, সমাজে এ রকম কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমরা মানুষের মধ্য থাকলে ভালো বলি। আবার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আমরা মানুষের মধ্য থাকলো খারাপ বলি। এগুলো হলো আমাদের সমাজে কিছু প্রচলিত মূল্যবোধ বা ভেলুজ (Values)। সমাজে যেমন রয়েছে রীতি-নীতি, তেমনি রয়েছে কিছু মূল্যবোধ।

আনাই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, সামাজিক রীতি-নীতির মতো সামাজিক মূল্যবোধ বা ভেলুজ (Values)গুলো ও কি পরিবর্তিত হয়?

সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনশীলতা অনুসন্ধান:

এবারে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে শিক্ষার্থীরা সময়ের সাথে সাথে এবং স্থানভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন অনুসন্ধান করব বৈজ্ঞানিক ধাপগুলো অনুসরণ করে।

অনুসন্ধানী কাজ-৫

বিষয়বস্তু:

কিছু অনুসন্ধানের প্রশ্ন (উদাহরণ):

- বর্তমানকালে বাংলাদেশের মানুষ বড়দেরকে সম্মান করা নিয়ে কী ধরনের মূল্যবোধ ধারণ করে আর আগে বাংলাদেশের মানুষ বড়দেরকে সম্মান করা নিয়ে কি ধরনের মূল্যবোধ ধারণ করত?
- বাংলাদেশের মানুষ বড়দেরকে সম্মান করা নিয়ে যে মূল্যবোধ ধারণ করে অন্য দেশের মানুষও কী একই রকম মূল্যবোধ ধারণ করে নাকি ভিন্ন রকম?

প্রশ্নে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে:

- তথ্য উৎস:
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:
- তথ্য সংগ্রহ:
- তথ্য বিশ্লেষণ:
- ফলাফল/সিদ্ধান্ত:
- উপস্থাপন:

বন্ধুর দলের কাজের মূল্যায়ন করি

আদর্শ/ প্রত্যাশা →	অনুসন্ধানের প্রশ্ন (প্রশ্নটি বা প্রশ্নগুলো সুনির্দিষ্ট, আকর্ষণীয় ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সমাধান যোগ্য)	প্রশ্নের মূল বিষয়বস্তু (প্রশ্নে যে মূল বিষয় আছে সেগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছে)	তথ্য উৎস (প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত তথ্য উৎস উল্লেখ করতে পেরেছে)	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করতে পেরেছে)	তথ্য সংগ্রহ (পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে ও রেকর্ড করতে পেরেছে)	তথ্য বিশ্লেষণ (সঠিক উপায়ে তথ্য সাজিয়ে/ হিসাব-নিকাশ করে অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর/ সমাধানে পৌঁছতে পেরেছে)	ফলাফল উপস্থাপন (স্পষ্টভাবে ও আকর্ষণীয় উপায়ে অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া আর ফলাফল উপস্থাপন করেছে)	মন্তব্য/ ফিডব্যাক
দল-১								
দল-২								
দল-৩								
দল-৪								
দল-৫								

নিজ দলের সদস্যদের মূল্যায়ন

পুরোপুরি করেছে, কিছুটা করেছে, আরও অনেক উন্নতি করতে হবে- এই কথাগুলো ব্যবহার করে ফিডব্যাক দিতে পারব আমরা।

দলের সদস্যদের নাম	আংশগ্রহণ (পুরো অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে)	অন্য সদস্যদের সাহায্য করা (যখন যেই সদস্যর সাহায্য প্রয়োজন, নিজেই আগ্রহ নিয়ে সাহায্য করেছে)	অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা (সব সময় বন্ধুদের মতামত শ্রদ্ধা করেছে নিজের মতের সাথে না মিললেও)	মতামত বা ফিডব্যাক
আনাই				
কাকন				
নাহিদ				
গণেশ				

সব দল নানা উপায়ে তাদের সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনশীলতার অনুসন্ধান উপস্থাপন করল নানা উপায়ে। তারা সবাই একমত হলো যে:

কিছু কিছু সামাজিক মূল্যবোধ আছে যেগুলো সাধারণত পৃথিবীর সব দেশেই একই রকম যেমন মিথ্যা বলা বা চুরি করাকে খারাপ মনে করা আর সবার সাথে মিলে মিশে থাকাকে ভালো মনে করা হয়। আবার কিছু কিছু মূল্যবোধ আছে যেগুলো সমাজ বা দেশ ভেদে ভিন্ন হতে পারে। সময়ের সাথে সাথেও আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়। এগুলো কোনোটাই অপরিবর্তনশীল বা ধ্রুব নয়।

আমাদের জীবনে সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের চর্চা

এবারে বন্ধুরা দলে বসে কিছু সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের তালিকা তৈরি করল, যা তারা চর্চা করতে চায়। সেখান থেকে বাছাই করে তারা ১০ টি সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করল, যা তারা দৈনন্দিন জীবনে চর্চা করতে চায়। এ জন্য তারা কাগজের গাছ বানাল- রঙ্গিন কাগজে গাছ এঁকে তা কাটল। এবার তা লাগাল ক্লাসের দেওয়ালে। গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা আছে কিন্তু কোনো পাতা নেই। তারা যখন ই কেউ এই নির্দিষ্ট সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত কোনো কাজ করে তখনই সেটি একটি রঙ্গিন কাগজের পাতায় লিখে সেই নির্দিষ্ট গাছটিতে জুড়ে দেয় তাদের নামসহ। বছর শেষে গাছটি পাতায় পাতায়

ভরে ওঠে। একটি গাছের ছবি নিচে দেখানো হলো।

বছর শেষে আমরা গাছ গুলো ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করি। নিচের বক্সে তোমাদের এই গাছ নিয়ে চিন্তার জন্য কিছু প্রশ্ন দেয়া আছে। বছর শেষে প্রশ্নগুলো অনুসারে গাছগুলো নিয়ে আমরা ভালোভাবে পর্‌যবেক্ষণ করব।

চিন্তা করি

- কোন গাছে বেশি পাতা হল?
- আমি কোন গাছে বেশি পাতা যোগ করেছি?
- কোন গাছে সবচেয়ে কম পাতা যোগ করেছি?
- কোন ধরনের চর্চা আমি বেশি করছি? কোন গুলোতে আমার আরও চর্চার প্রয়োজন? কিভাবে তা করতে পারি?

প্রাকৃতিক উপাদানও কি সময়ের সাথে সাথে বদলায়?

আমরা দেখলাম সময়ের সাথে সাথে সমাজের মানুষের চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস, রীতি-নীতি পরিবর্তিত হতে পারে। আচ্ছা, সামাজিক এই উপাদান ছাড়া প্রকৃতির উপাদানও কি পরিবর্তিত হতে পারে? মিলি বলল, "প্রকৃতির পরিবর্তন? এই যে, বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়, শীতকালে হয় না বললেই চলে। শীতকালে অনেক গাছের পাতা ঝড়ে যায়"। খুশি আপা বললেন, "হ্যাঁ, তাই তো। আর কী কী পরিবর্তন হয় ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে?" সুমন বলল, "একটা বুদ্ধি এসেছে।

অনুসন্ধানী কাজ-৬

আমরা প্রত্যেকে দলে ভাগ হয়ে কাগজ একসাথে আটকে মলাট দিয়ে একটি বই বানাই। বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের আশপাশের আবহাওয়া, গাছপালা, পাতা, মাটি, আকাশ ইত্যাদির যে পরিবর্তন তা আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করব বছরব্যাপী। বছর শেষে আমরা একে অন্যেরটি দেখব। প্রতি পৃষ্ঠায় এক মাসের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তনগুলো নানাভাবে সংরক্ষণ করি লিখে, ছবি এঁকে, আর পরিবর্তিত বিভিন্ন উপাদানগুলোর নমুনা সংগ্রহ করে। " সুমনের আইডিয়াটা সবার খুব পছন্দ হলো। এরপর ওরা একেক দল একেক ধরনের আবহাওয়া ও প্রকৃতির উপাদান বেছে নিল। খুশি আপা বললেন, দল তৈরির ক্ষেত্রে আমরা এমনভাবে দল তৈরি করব যেন আমাদের প্রত্যেকের বাড়ি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় হয়। তাহলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গার প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ করতে পারব।

- বিষয়বস্তু:
- অনুসন্ধানের প্রশ্ন:
- তথ্য উৎস:
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:
- তথ্য সংগ্রহ:
- তথ্য বিশ্লেষণ:
- ফলাফল/সিদ্ধান্ত:
- উপস্থাপন:

পদ্ম দল:_এই দল অনুসন্ধান করবে গাছের পাতা। তারা প্রতি ১ মাস পর পর নির্দিষ্ট একটি গাছের পাতা পর্যবেক্ষণ করবে, তার রঙিন ছবি আঁকবে, ছবি তুলে প্রিন্ট করে সংগ্রহ খাতায় লাগাবে, পাতার নমুনা সংগ্রহ করবে। বছর শেষে পাতার ধারাবাহিক পরিবর্তন বন্ধুদের কাছে ছবিসহ তুলে ধরবে। এ ধরনের, কিন্তু গাছের পাতার নাম আর ৬টি ঋতুতে তার পরিবর্তন থাকবে।

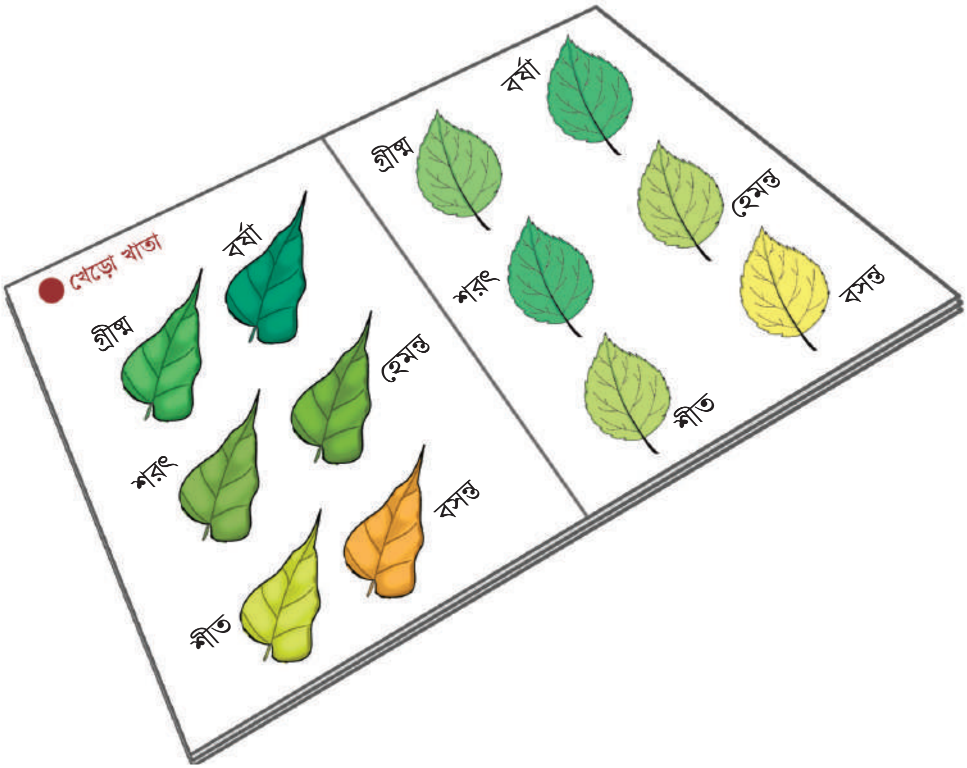

শাপলা দল:_এই দল অনুসন্ধান করবে বৃষ্টি। তারা বৃষ্টির পানি জমানোর জন্য কয়েকটি একই রকম দাগ কাটা বোতল তৈরি করবে। এরপর প্রতি মাসে তারা বৃষ্টির পরিমাণ হিসাব করবে। বছর শেষে কোন ঋতুতে কীরকম বৃষ্টি হয় তা সবার সামনে গ্রাফসহ তুলে ধরবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকার বৃষ্টিপাতের তুলনাও সম্ভব হবে। সাথে পরিমাপের দাগ কাটা পাত্রে পানি পর পর সাজিয়ে দেখাবে।

মিলির এলাকায় ঋতুভেদে বৃষ্টিপাতের পরিমান

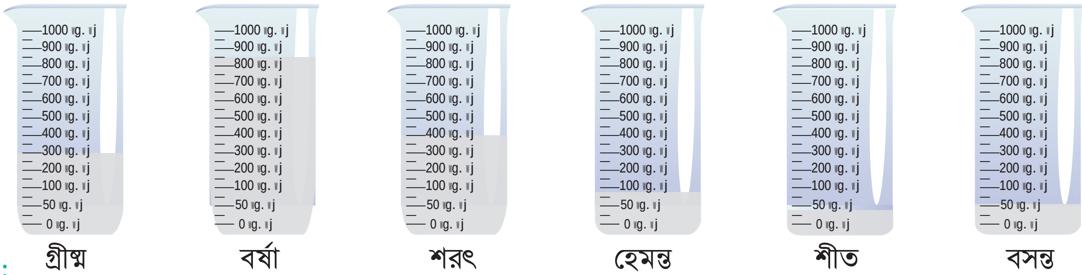

:

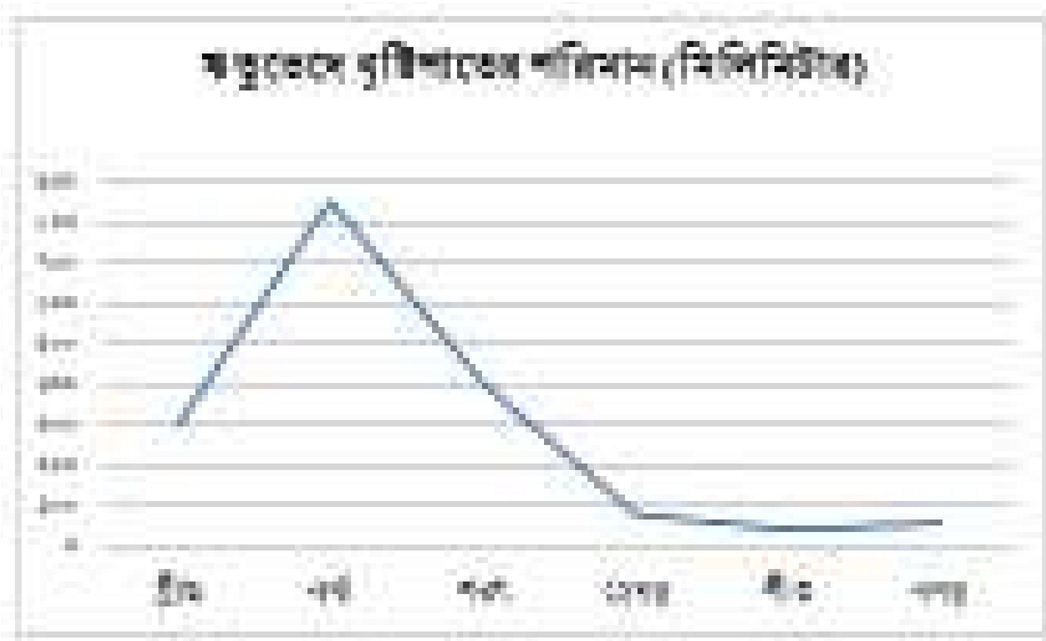

গ্রীষ্ম ৩০০

বর্ষা ৮৫০

শরৎ ৪০০

হেমন্ত ৮০

শীত ৪০

বসন্ত ৫৫

রনির এলাকায় ঋতুভেদে বৃষ্টিপাতের পরিমান

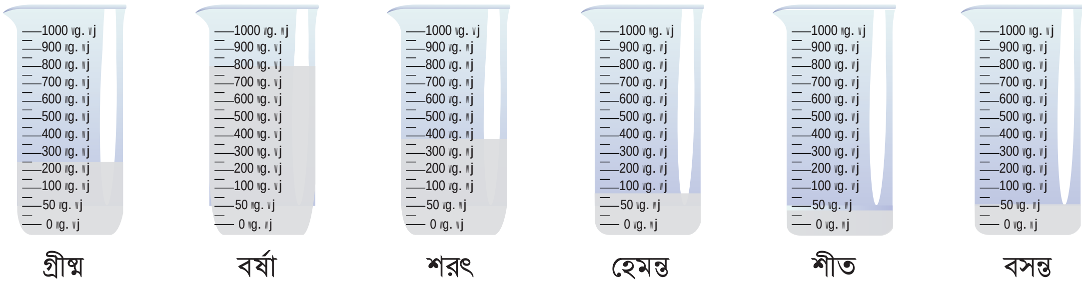

গ্রীষ্ম ২৫০

বর্ষা ৮০০

শরৎ ৩৮০

হেমন্ত ৭০

শীত ৩৫

বসন্ত ৫০

গোলাপ দল: এই দল অনুসন্ধান করবে মাটি। তারা প্রতি ২ মাস পর পর ভিন্ন ভিন্ন এলাকার মাটি পর্যবেক্ষণ করবে, মাটির নমুনা সংগ্রহ করবে এবং মাটির অবস্থার বর্ণনা লিখবে।

সময়ের সাথে সাথে ভূমিরূপও কি বদলায়?

পরের দিন খুশি আপা ক্লাসে এলে মিলি বলল, "আপা, আমরা তো সময়ের সাথে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের কী কী পরিবর্তন হয় তা অনুসন্ধান করছি। এবার আমরা দেখি যে আমাদের চারপাশে অনেক ধরনের ভূমিরূপ আছে, এগুলোরও কি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটে?" খুশি আপা বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ মিলি, সময়ের সাথে সাথে ভূমিরূপেরও পরিবর্তন হয়। চলো আমরা আগে পৃথিবীর পরিবর্তনের কিছু ছবি দেখি"।

মহাদেশীয় সঞ্চারণ

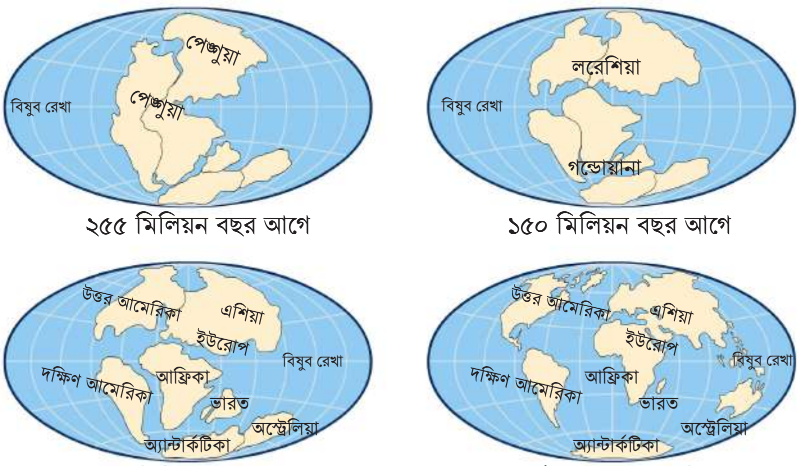

২৫৫ মিলিয়ন বছর আগে

১৫০ মিলিয়ন বছর আগে

১০০ মিলিয়ন বছর আগে

বর্তমান সময়ের পৃথিবী

ছবি দেখা শেষ হলে নীলা বলল আপা ছবিতে আমরা দেখলাম মহাদেশগুলো ক্রমান্বয়ে সরে সরে যাচ্ছে।

খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ নীলা, আর আমাদের প্রত্যেকটি মহাদেশ আছে একেকটি প্লেট বা পাতের ওপর। এই পাতগুলো যেহেতু ভেসে থাকে, তাই কখনও ভেসে একে অপরের কাছে আসে আবার কখনও একে অন্যের থেকে দূরে চলে যায়।

মিলি বলল, কিন্তু আপা, প্লেটগুলো ভেসে থাকে কেন?

খুশি আপা বললেন, খুব ভালো প্রশ্ন মিলি। এটা জানার জন্য চলো আমরা একটা মজার কাজ করি।

তখন খুশি আপা একটি তরমুজ নিয়ে আসলেন। তা দেখে কাঁকন বলল, আপা, আজ কি আমরা সবাই মিলে তরমুজ খাব!

কাঁকনের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল।

খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ কাঁকন অবশ্যই খাবো তবে তার আগে আমরা তরমুজ নিয়ে একটি মজার জিনিস দেখব।

তখন খুশি আপা তরমুজটি কাটলেন। কাটার পর তরমুজের একটি ফালি দেখিয়ে বললেন দেখো তো এটা দেখতে কিসের মতো লাগছে?

সবাই চিন্তায় পড়ে গেল।

খুশি আপা তখন বললেন, আচ্ছা চিন্তা সঠিকভাবে করার জন্য আমরা একটি ছবি দেখি চলো।

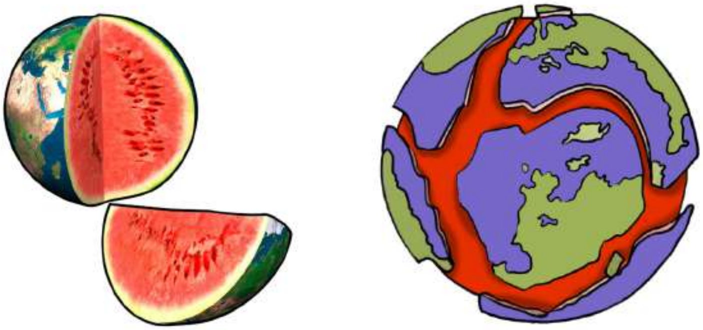

ছবি দেখার পর মিলি বলল, আপা, এটা দেখতে একদম পৃথিবীর মতো লাগছে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ মিলি।

রনি বলল, আপা তরমুজের ভেতরে যেমন নরম অংশ আছে পৃথিবীরও কি একই রকম নরম অংশ আছে?

ওমেরা বলল আপা, আমি বই পড়া ক্লাব থেকে একটি বই পড়ে জেনেছিলাম পৃথিবীর ভেতরে গলিত লাভা আছে।

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ ওমেরা।

রনি বলল, কিন্তু আপা আমরা তো জানি লাভা হচ্ছে তরল জিনিস, তাহলে পৃথিবীর উপরি ভাগের তো সব সময় নড়াচড়া করা উচিত তাই না?

খুশি আপা বললেন, নড়ছে তো কিন্তু আমরা সব সময় সেটা টের পাই না।

কাঁকন বলল, তাহলে কখন কখন টের পাব?

মিলি বলল, আমার মনে হয় যখন ভূমিকম্প হয় তখন!

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ মিলি। আবার এই প্লেটগুলোর বিভিন্ন রকম চলাচলের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর নানা ভূমিরূপের।

সুমন বলল, কিন্তু সেটা কীভাবে আপা?

খুশি আপা বললেন, চলো, আমরা একটা মজার পরীক্ষণের মাধ্যমে সেটা দেখি।

উপকরণ:

৬টি বিস্কুট (প্লেট কে প্রতিনিধিত্ব করে)

শেভিং ফোম/জেলি/কাদামাটি (এগুলো ম্যাগমাকে প্রতিনিধিত্ব করে)

চামচ

টিস্যু (এটি ভূত্বককে প্রতিনিধিত্ব করে)

ছোট ৩টি ট্রে/থালা

১. প্রথমে ট্রের মধ্যে শেভিং ফোম স্প্রে করে/জেলি/কাদামাটি দিয়ে ম্যাগমার একটি স্তর তৈরি করব।
২. চামচ দিয়ে ম্যাগমা টি সমতল করব যাতে এটি সবদিকে সমান হয়।
৩. ম্যাগমার উপরে একটি টিস্যু আলতো করে পেতে দেব।

কর্মপদ্ধতি-ক: ১নং ট্রে

১. এরপর ম্যাগমার উপরে আমরা প্রথমে দুটি বিস্কুটকে আলতো করে একসাথে রাখব যাতে তারা একটি আয়তক্ষেত্র তৈরি করে। (বিস্কুটগুলো একটি করে প্লেটকে প্রতিনিধিত্ব করে)
২. এবার আমরা আলতো করে প্লেট দুটিকে পরস্পর থেকে টেনে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবো। এরপর একটি গ্লোবের সাহায্যে দেখব দুটি প্লেট একে অন্যের থেকে দূরে সরে গেলে সেই স্থানে কোন ধরনের ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মপদ্ধতি-খ: ২ নং ট্রে

১. এরপর ম্যাগমার উপরে আমরা আবার দুটি বিস্কুটকে একটু দূরত্বে রাখব
২. এরপর দুটি বিস্কুটকে একে অন্যের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ করাব এবং সেই স্থানে কোন ধরনের ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়েছে তা দেখব।

কর্মপদ্ধতি-গ: ৩ নং ট্রে

১. এবারো ম্যাগমার ওপরে আমরা আবার দুটি বিস্কুটকে একটু দূরত্বে রাখব
২. এবার দুটি বিস্কুটকে একে অন্যের পাশ দিয়ে নিয়ে যাব, কোনো সংঘর্ষ ছাড়া এবং সেই স্থানে কোন ধরনের ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়েছে তা দেখব।

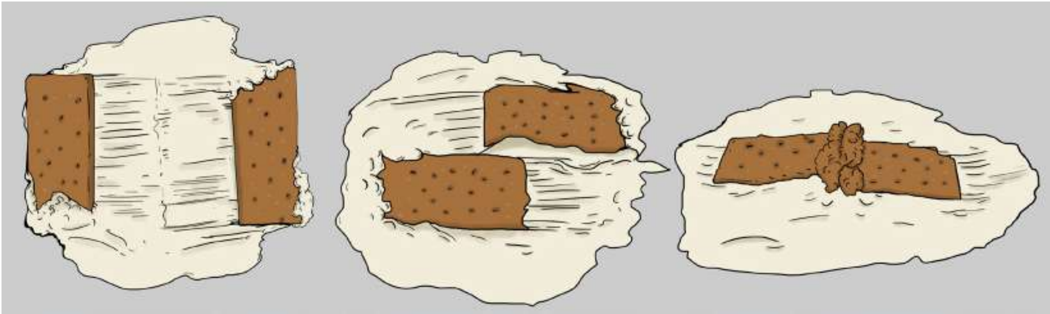

ছক: বিস্কুটের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ

ট্রে	সংঘর্ষের ফলে ম্যাগমা ও প্লেটের অবস্থার চিত্র
১ নং ট্রে	
২ নং ট্রে	
৩ নং ট্রে	

ছবি আঁকা শেষ হলে রনি বলল, আপা আমরা তো দেখলাম প্লেটের চলাচলের কারণে কখনও তৈরি হচ্ছে পাহাড়ের মতো ভূমিরূপ আবার কখনও হচ্ছে মহাসাগরের সৃষ্টি। বাংলাদেশেও তো বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ আছে, সেগুলোও তো এ রকম কোনো না কোনো ঘটনার দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে তাই না!

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ রনি।

বাংলাদেশের ভূমিরূপ:

সুমন বলল, আমরা তো মানচিত্রে দেখেছি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগে আছে পাহাড়ি অঞ্চল। আর কোথায় কী কী ধরনের ভূমিরূপ আছে?

মিলি বলল, আপা আমরা তো এটা একটা অনুসন্ধানমূলক কাজের সাহায্যে দেখতে পারি তাই না!

খুশি আপা বললেন, চমৎকার, তাহলে চলো আমরা অনুসন্ধান করে বের করি বাংলাদেশের কোথায় কোথায় কোন কোন ধরনের ভূমিরূপ আছে।

আমরা এই অনুসন্ধান কাজে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান- অনুসন্ধানী পাঠ্য বইয়ের সাহায্য নিতে পারি আবার ইন্টারনেট ও অন্যান্য বই থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

সুমন বলল, আপা, আমরা আমাদের এই অনুসন্ধানী কাজের ফলাফল বাংলাদেশের একটি মানচিত্রে বিভিন্ন রংয়ের মাধ্যমে স্থানগুলো চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পারি। খুশি আপা বললেন, চমৎকার প্রস্তাব।

তখন ওরা সবাই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশের একটি মানচিত্রে সময়ের সাথে সাথে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ভূমিরূপ চিহ্নিত করল এবং লিজেন্ড বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে কোন রং কোন ভূমিরূপকে নির্দেশ করে সেটি চিহ্নিত করল।

অনুসন্ধানী কাজ-৭

- বিষয়বস্তু:
- <u>অনুসন্ধানের প্রশ্ন</u>
- তথ্য উৎস:
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:
- তথ্য সংগ্রহ:
- তথ্য বিশ্লেষণ:
- ফলাফল বা সিদ্ধান্ত:
- উপস্থাপন: মানচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারি আমরা

বাংলাদেশের ভূমিরূপ

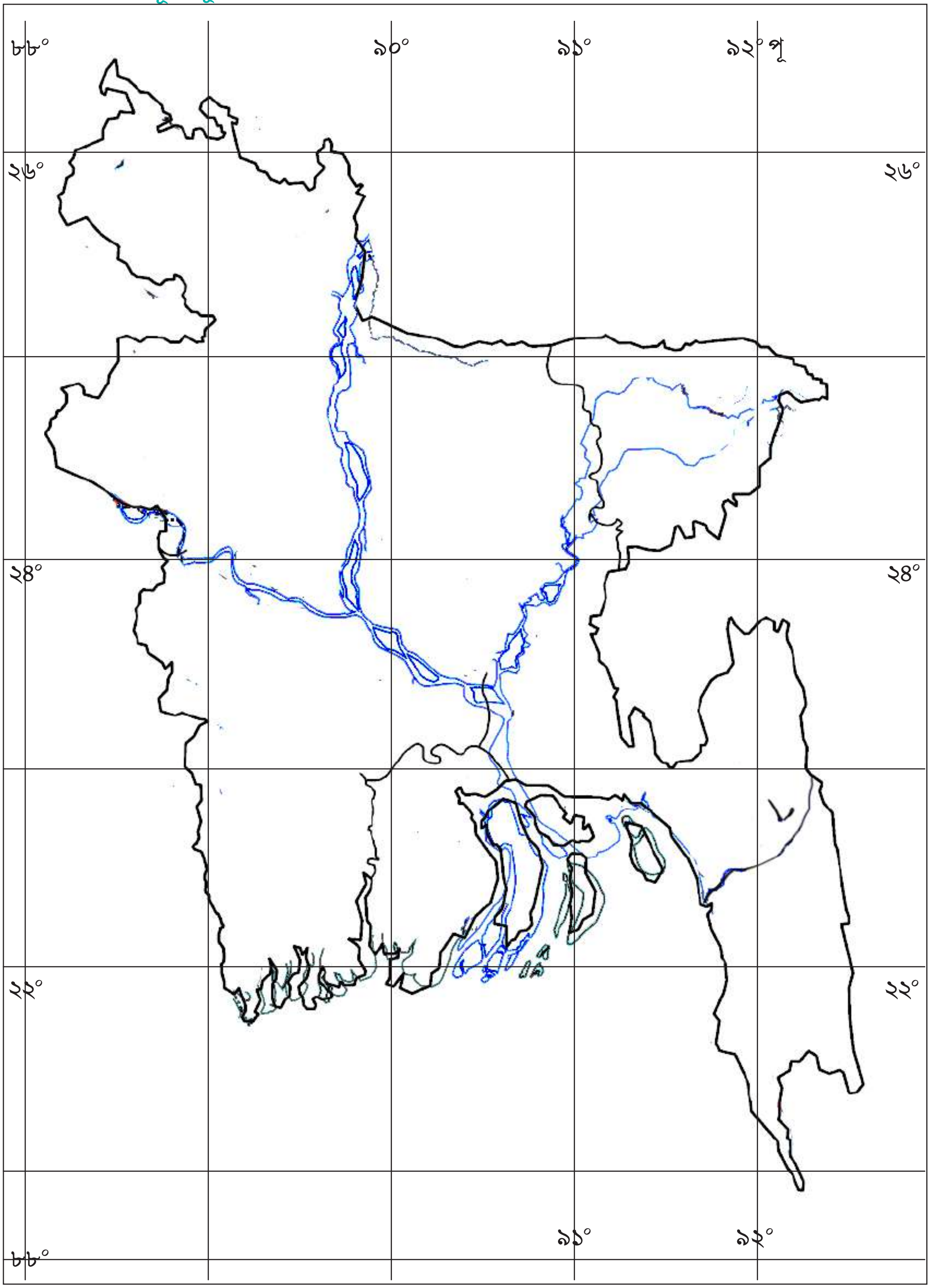

প্লেটের চলাচল ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আজ অন্বেষা ক্লাসে মন খারাপ করে বসে আছে। সুমন এসে ওর মন খারাপের কারণ জানতে চাইলে অন্বেষা জানাল তার মামার বাড়ি সিলেটে, ওখানে বেশ কিছুদিন ধরে ঘনঘন ভূমিকম্প হচ্ছে এ জন্য ওরা সবাই খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। মিলি বলল, আমরা তো দেখলাম প্লেটের নড়াচড়ার কারণে ভূমিকম্প হয়, তাহলে আমাদের বাংলাদেশেও নিশ্চয় প্লেটগুলো নড়ছে। ওরা ঠিক করল আজ খুশি আপা ক্লাসে এলে ওরা জানতে চাইবে সিলেট অঞ্চলে এত ঘন ঘন ভূমিকম্প হওয়ার সাথে মহাদেশীয় পাত বা প্লেটের কোনো সম্পর্ক আছে কি না!

এমন সময় খুশি আপা ক্লাসে এলে ওরা অন্বেষার মন খারাপের বিষয়টি তাকে বলল।

খুশি আপা বললেন, এই বিষয়টা সম্পর্কে জানতে প্রথমে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান কোন কোন প্লেটে পড়েছে সেটা দেখতে হবে। চলো আমরা বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক অবস্থানের একটা স্যাটেলাইট থেকে নেওয়া ছবি দেখি।

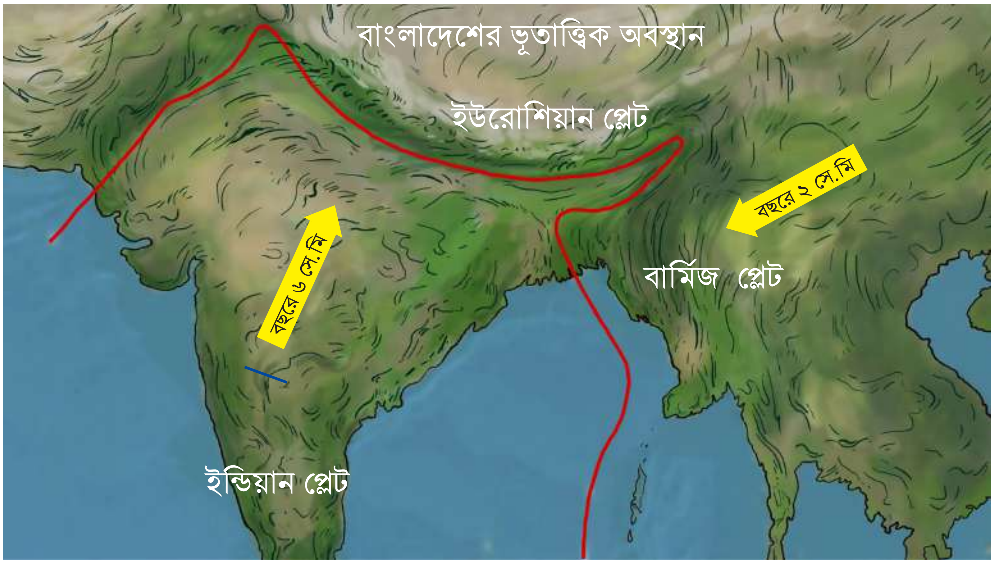

চ্যুতি রেখা (Fault line)

ছবিটি দেখার পর নীলা বলল, আপা, ছবিতে দেখছি বাংলাদেশের অবস্থান তো ৩টি প্লেটের মাঝখানে। কিন্তু ওই লাল রেখাটি কী বোঝাচ্ছে?

কাঁকন বলল, আপা আমরা যখন পরীক্ষণটি করেছিলাম তখন দেখেছিলাম দুটি প্লেট যখন সংঘর্ষ ছাড়া পাশাপাশি চলে যায় তখন সেখানে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়। এটা কি তেমনই কিছু?

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ কাঁকন, এটার একটি ভালো নামও আছে। একে বলে চ্যুতি রেখা (Fault line)। সাধারণত এই চ্যুতি রেখার কাছাকাছি অঞ্চলে ভূকম্পন হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

রনি বলল, এখন বুঝতে পারছি বাংলাদেশের সিলেট থেকে শুরু করে পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত চলে গেছে এই চ্যুতি রেখা। খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই আর এই কারণে বাংলাদেশের কিছু এলাকা হয়ে উঠেছে ভূমিকম্পপ্রবণ। চলো মানচিত্রে সেই এলাকাগুলো দেখি।

ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল

সূত্র: জিএসবি

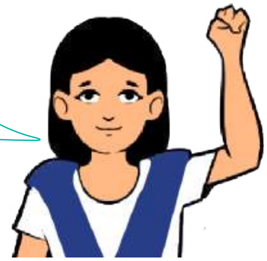

মিলি বলল, তাহলে এখন উপায়?

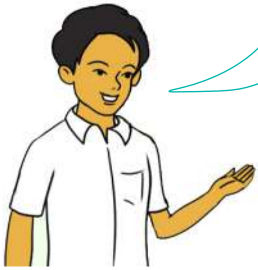

সুমন বলল, উপায় একটাই, আমরা তো আর প্লেট গুলর অবস্থান বা চ্যুতি রেখা বদলাতে পারব না। আমাদের ভূমিকম্প হলে যেন ক্ষয়ক্ষতি কম হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

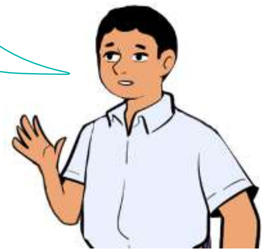

রনি বলল, কিন্তু কীভাবে? বাংলাদেশের শহর অঞ্চলগুলোতে যেভাবে অপরিকল্পিত নগরায়ণ গড়ে উঠছে তাতে ক্ষতি কি কমানো যাবে!

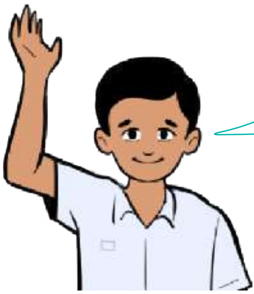

রবিন বলল আমরা মানুষকে সচেতন করতে পারি যেন সঠিকভাবে নগর পরিকল্পনা করে।

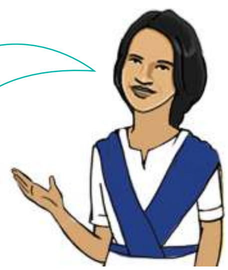

রূপা বলল এ ছাড়া আমরা ভূমিকম্প হলে কী করলে ক্ষতির পরিমাণ কম হবে সে বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ মানুষের সাথে কথা বলতে পারি।

অন্বেষা বলল আমার একজন কাকা আছেন যিনি অগ্নিনির্বাপক অফিসে কাজ করেন। আমি শুনেছি তারা এ বিষয়ে মানুষদের সচেতনতার কাজটি করেন। আমরা তার সাহায্য নিতে পারি।

খুশি আপা বললেন, খুব ভালো প্রস্তাব। কিন্তু এটা তো একটা বড় আয়োজন। এটা তো তোমরা একা একা করতে পারবে না।

মিলি বলল, সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে আমরা এই আয়োজন করতে পারি।

ভূমিকম্প সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন:

রনি বলল, আপা আমরা তো ষষ্ঠ শ্রেণিতে সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন করেছিলাম। যেহেতু আমাদের কমিটির বয়স এক বছর হয়ে গেছে তাহলে আমরা আবার নতুনভাবে নির্বাচন করে আমাদের সপ্তম শ্রেণির জন্য সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের কার্যক্রম শুরু করতে পারি।

ওরা তখন খুশি আপার সহযোগিতায় ষষ্ঠ শ্রেণির মতো করে পুনরায় সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন করল এবং সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের আয়োজনে একজন অগ্নিনির্বাপক অফিসার এনে ভূমিকম্প দুর্যোগ হলে এবং পরে কী করণীয় সে সম্পর্কে একটি কর্মশালার আয়োজন করল।

কর্মশালার পরে তারা ভূমিকম্প চলাকালীন এবং পরবর্তীতে যা যা করণীয় সেই বিষয়গুলোর উপর তাদের বিদ্যালয়ের মাঠে একটি ডিসপ্লের আয়োজন করল। ডিসপ্লে শেষ হলে খুশি আপা সবাইকে অভিনন্দন জানালেন।

ভূমিকম্প সতর্কতা

সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্তন:

এবারে সবাই একটি মজার কাজ করল। এই ক্লাসে শিক্ষার্থীরা যত ধরনের পরিবর্তন অনুসন্ধান করেছে সেগুলোর তালিকা তৈরি করল। সবাই হাত তুলে তুলে বিভিন্ন অনুসন্ধানের কথা বলল আর একজন বোর্ডে লিখলো। এবার এগুলোকে তারা শ্রেণি বিভাগ করল। কী কী ধরনের পরিবর্তন? সেগুলোর মধ্যে আবার কী কী বিষয়ের অনুসন্ধান হলো? এসো আমরাও নিচের শ্রেনিবিন্যাসটি পূরণ করি।

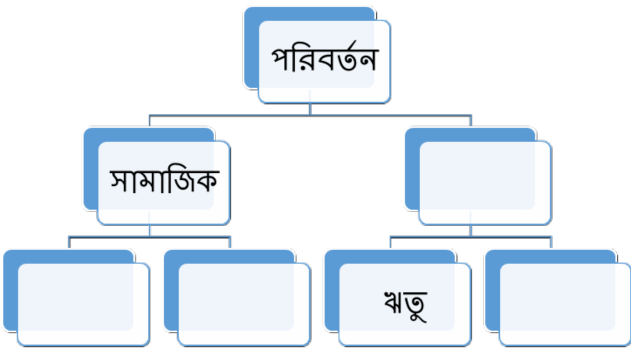

পরিবর্তনশীলতা নিয়ে বিতর্ক

শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন কাঠামো ও উপাদানের পরিবর্তন নিয়ে কিছু বিবৃতি লিখি এবং সেগুলোর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরি।

বিতর্কের জন্য কিছু বিবৃতির উদাহরণ-

- সামাজিক উপাদানের কোনো বৈশিষ্ট্যই ধ্রুব নয়, বরং ক্রমাগত পরিবর্তনশীল।
- প্রাকৃতিক উপাদানের সব বৈশিষ্ট্যই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল।
- সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।
- প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন আমাদের জন্য শুধু ক্ষতির কারণ।

এমন যদি হতো! পরিবর্তনহীন পৃথিবী কল্পনা করি

খুশি আপা বললেন, চলো আমরা চোখ বন্ধ করে চিন্তা করি, যদি আমাদের সব জায়গায় ভূমিরূপ একই রকম হত-ধর পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো মরুভূমি নেই, নেই সাগর, মালভূমি, সমুদ্র। আছে শুধু সমতল ভূমি। তাহলে কেমন হতো? কেমন হতো আমাদের জীবন? কী কী কাজ করা যেত না? কী কী কাজ নতুনভাবে করতে হতো? এ রকম একটি ছবিও আঁকি।

এমন যদি হতো, পৃথিবীর সব ভূমিরূপ একটি-সমতলভূমি। তাহলে কেমন হতো বলো তো!

তাহলে পৃথিবী অনেক গরম হয়ে যেত। পাখিরা গাছ ছাড়া তাদের বাসা হারাত।

....

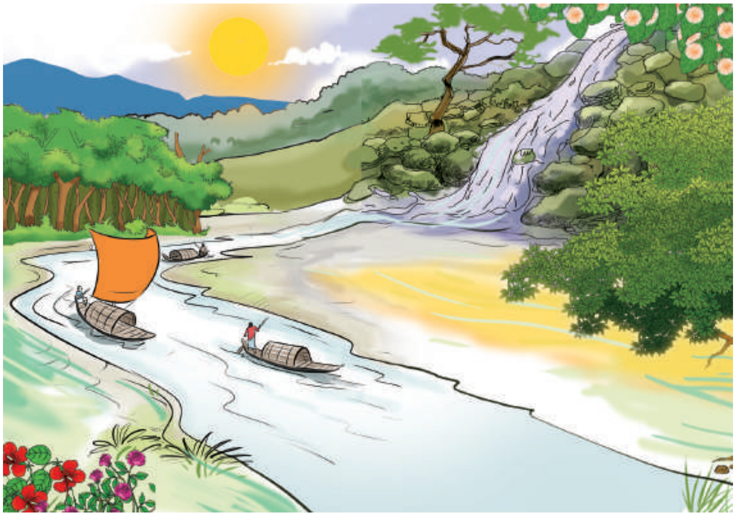

ঠিক একইভাবে আমরা আমাদের আশপাশের বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়গুলোতে যদি সময় ও স্থান ভেদে পরিবর্তিত না হতো, তবে কেমন হতো তা চিন্তা করে লিখি ও ছবি আঁকি। যেমন- সবার পেশা একই হলে, প্রতিদিন, সারা জীবন একই খাবার খেলে ইত্যাদি।

একেক সময়ের সমাজ ছিল একেক রকম। একেক সময়ের প্রকৃতি একেক রকম। একেক এলাকার রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, যেমন ভিন্ন, তেমনি ভিন্ন তাদের ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া। কী চমৎকার এই বৈচিত্র্য! যদি সব সময় প্রচলিত থাকত একই রীতি-নীতি, সমাজ ও প্রকৃতির উপাদান একই রকম হতো, তবে কেমন হতো? আমাদের অনুসন্ধান কি এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময় হতো?

এ পর্যন্ত যা যা শিখলাম:

এ পর্যন্ত আমরা যা যা শিখেছি তার বিবেচনায়,

১। যে তিনটি বিষয় আমি একদম নতুন শিখেছি

-

-

-

২। যে তিনটি বিষয় আমার কাছে খুব আগ্রহ জাগিয়েছে বা মজা লেগেছে

-

-

-

৩। যে তিনটি বিষয় আমার নতুন করে জানার ইচ্ছা হচ্ছে , এখান থেকে জানতে পারিনি

-

-

-

৪। যে বিষয়গুলো আমার কাছে স্পষ্ট নয় বা ঠিকমত বুঝতে পারিনি

-

-

-

সম্প্রদায়

বেদে-কন্যা

সামনে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব। তাই নিয়ে ক্লাসের সবার অনেক জল্পনা-কল্পনা। "আমি তিনশত মিটার দৌড় দেব! আমি খেলব মোরগ লড়াই! হাঁড়ি ভাঙার খেলায় সবচেয়ে বেশি মজা হয়!!"— টিফিনের সময় তুমুল আলোচনা চলছিল।

সালমা: আমি 'যেমন খুশি তেমন সাজো'তে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সাজব।

শিহান: আমি সাজব 'বঙ্গবন্ধু'। আমার দাদুর মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা পরব। ডান হাতের তর্জনী তুলে সাতই মার্চের ভাষণ দেব। ভাষণটা আমি একটুখানি পারি, আরও ভালো করে শিখে নেব।

মামুন: আমি সাজব রাখাল ছেলে। মাথায় গামছা বেঁধে বাঁশি বাজাব। আমি বাঁশের বাঁশি বাজাতে পারি।

মিলি: আমি বেদে-কন্যা সাজব। আমাদের স্কুলে এইটের যে সানজিদা আপু; ওদের বেদে পরিবার। আপু আমাকে সাজিয়ে দেবে বলেছে।

আদনান: সানজিদা আপুকে বললে আমাকে সাপুড়ে সাজিয়ে দেবে?

মিলি: আমি বলে দেখব। নিশ্চয়ই দেবে।

আদনান: আমি তাহলে 'বাবুরাম সাপুড়ে' সাজব। আমার কাছে একটা খেলনা বীণ বাঁশিও আছে।

সবাই তখন যেমন খুশি তেমন সাজোতে কে কী সাজবে, কেমন করে সাজবে— তাই নিয়ে দারুণ দারুণ সব পরিকল্পনা করতে লাগল। কেউ সাজবে চাকমা মেয়ে, কেউ হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেউ সাজবে আইনস্টাইন, কেউ হবে প্রীতিলতা, কেউ হবে মুক্তিযোদ্ধা। ওরা এই গল্পে এমন মজা পেল যে কখন ক্লাস শুরুর ঘণ্টা পড়ল আর কখন খুশি আপা এসে ক্লাসে ঢুকলেন, ওরা খেয়ালই করল না।

খুশি আপা: কী এত মজার কথা হচ্ছে?

হাচ্চা: আমরা খেলার উৎসব নিয়ে কথা বলছিলাম। যেমন খুশি তেমন সাজোতে কে কী সাজবে সেই কথা নিয়ে মজার আলাপ হচ্ছিল।

খুশি আপা: তাই নাকি! বাহ, দারুণ মজার তো!

এরপর খুশি আপার কাছে ওরা কে কী সাজবে, কীভাবে সাজবে বিস্তারিত বলতে লাগল। খুশি আপা বললেন, তোমরা তো অসাধারণ সব পরিকল্পনা করেছ! তিনি যখন জানলেন, মিলি বেদে-কন্যা সাজতে চায়, তখন বললেন, আমাদের এলাকায় কয়েক দিন হলো একটা বেদের বহর এসেছে। আনাই বলল, বেদের বহর মানে কী? খুশি আপা বললেন, আমাদের এলাকার বেদেরা যেমন ঘরবাড়ি বানিয়ে থাকে, সব বেদেরা তেমনভাবে থাকে না। অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে নৌকায় চড়ে দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। ওরা সবাই খুশি আপাকে ধরল, "আমরা বেদের বহর দেখতে যেতে চাই।"

এক সকালে ওরা খুশি আপার সঙ্গে বেদের বহর দেখতে গেল।

দেখে আসি বেদে বহর

খুশি আপার সঙ্গে সবাই নদীর দিকে গেল। নদীর তীর ঘেঁষে সারি সারি নৌকার যেন মেলা বসেছে। নৌকায় আর তীরে নানান বয়সী অনেক মানুষ। ওরা হেঁটে হেঁটে দেখতে লাগল।

একটি মেয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। খুশি আপার কাছে জানতে চাইল, কাউকে খুঁজছেন?"

খুশি আপা: আমরা তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছি। তোমাদের সর্দারের সঙ্গে গতকাল আলাপ করে গিয়েছিলাম।

মেয়ে: আসুন, আপনাদের সর্দারের কাছে নিয়ে যাই।

মেয়েটির সাথে সবাই বেদে সর্দারের কাছে গেল। খুশি আপা সর্দারের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

গণেশ: আগে কখনও আপনাদের দেখিনি। আপনাদের বাড়ি কি অনেক দূরে?

সর্দার: এই নৌকাই আমাদের ঘর। এখানে যে পঁচিশ পরিবারের মানুষ, তাদের নিয়ে আমাদের বাড়ি। আমরা নিজেদের ঘরবাড়ি নিয়ে সারা বছর নদীতে ঘুরে বেড়াই। কিছুদিন এক জায়গায় থাকি আবার নতুন জায়গায় চলে যাই।

আয়েশা: দারুণ মজার তো! কত দিন ধরে আপনারা নৌকায় থাকছেন?

সর্দার: কত শত বছর ধরে যে আমরা নৌকায় থাকি, কেউ সেটা ঠিক করে বলতে পারে না। আমার জন্ম এই নৌকায়, আমার বাপ-মায়েরও জন্ম নৌকায়, তাঁদের বাবা-মাও নৌকায়ই জন্মেছিলেন। কেউ বলে যাযাবর জীবনের আগে আমরা মিয়ানমারে থাকতাম, কেউ বলে ভারতে। কেউ আবার বলে, এদেশের সাঁওতালরা আমাদের পূর্ব পুরুষ।

ফ্রান্সিস: ঝড়-বৃষ্টি হলে আপনাদের নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হয়! আবার যখন বৃষ্টি হয় না, নদীতে পানি কম থাকে, তখনও অসুবিধা হয়। তবু এ রকম নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর জীবন অন্য রকম আনন্দের।

সর্দার: কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। নৌকার জীবনে আনন্দও আছে, কষ্টও আছে। কিন্তু শত শত বছর ধরে আমরা নৌকায় থাকছি, আর এদিকে ডাঙার পৃথিবী কত বদলে গিয়েছে! আমাদের অনেকেই এখন বেদে জীবন ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে, অনেকে আবার নৌকা ছেড়ে ডাঙায় থাকতে শুরু করেছে।

মামুন: এদেশে কি আপনাদের মতো আরও বেদে আছে?

সর্দার: নিশ্চয়ই। কতজন আছে সেই হিসাব অবশ্য আমি জানি না। তবে কয়েক লাখ তো হবেই।

খুশি আপা: খবরের কাগজে পড়েছিলাম, বাংলাদেশে প্রায় আট লক্ষ বেদে আছে। তবে তাদের সবার জীবন এক রকম না।

সর্দার: আপনি ঠিকই বলেছেন, আপা। বেদেরা সবাই নৌকায় থাকে না। সবার কাজও এক রকম না। আমরা সাপ ধরি, সাপের খেলা দেখাই, নানা রকম ওষুধ, তাবিজ বিক্রি করি।

আমাদের বলে ‘সাপুড়ে’। ‘গাইন’ বেদেরা সুগন্ধি মসলা বিক্রি করে। আবার ‘শানদার’ বেদেরা আছে যারা মেয়েদের চুরি, ফিতা, সাজগোজের জিনিস বিক্রি করে। ‘বাজিকর’ বেদেরা যাদু দেখায়, সার্কাস দেখায়। অন্য বেদেদের কেউ পুকুরে হারানো জিনিস খুঁজে দেয়, কেউবা বানরের খেলা দেখায়, টিয়াপাখি দিয়ে মানুষের ভাগ্য গণনা করে । তবে সকল বেদেই তন্ত্রমন্ত্র, যাদুটোনা জানে।

মিলি: আমি আপনাদের বহরের মেয়েদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

সর্দার: এতক্ষণে তো বেশির ভাগ মেয়েই বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের সমাজের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের আয়-রোজগারের কাজে যেতে হয়। বেলা হয়েছে, অনেকেই বেরিয়ে পড়েছে। তবে সবাই এখনও যায়নি। যারা আছে, চাইলে তাদের যে কারোর সঙ্গে তুমি কথা বলতে পারো।

রনি: মেয়েরাই কি কেবল রোজগার করে, ছেলেরা করে না?

সর্দার: আমাদের সমাজের পুরোনো রীতি অনুযায়ী, মেয়েরা বিয়ের সময় বরের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়। তাই মেয়েরা রোজগার করবে আর ছেলেরা বাচ্চা সামলানো, রান্না-বান্না আর ঘরের কাজের দায়িত্ব নেবে— এটাই নিয়ম। তবে ছেলেরা মাছ ধরে, জঙ্গল থেকে সাপ ধরে আনে, মাঝে মাঝে সাপের খেলাও দেখায়। এখন অনেকেই আয় রোজগারও করে।

ফাতেমা: আপনাদের বিয়ের রীতি-নীতি সম্পর্কে আরও কিছু জানতে ইচ্ছে করছে।

সর্দারের সঙ্গে ওরা যখন গল্প করছিল তখন বেদে দলের অনেকেই আশপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একটা ছেলে বলল, বেদেরা নিজেদের সমাজের মধ্যেই বিয়ে করে। এদেশের বেশির ভাগ বেদে মুসলমান, আমরাও। তাই আমাদের বিয়ে মুসলমান রীতিতে হয়। তবে বিয়েতে কোনো নিমন্ত্রণ, খাওয়া-দাওয়া, উপহার দেওয়া-নেওয়া হয় না। বিয়ের সময় আমরা সবাই মিলে নাচগান করি। খুব মজা হয়।

এর মধ্যে একটা ছোট ছেলে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। তার গলায় একটা সাপ পেঁচানো। অন্বেষা আর সুমন হঠাৎ সাপ দেখে খুব চমকে উঠল। তখন একজন লোক ছেলেটাকে বকতে লাগল, ছেলেটাও কী যেন বলল। কিন্তু এই দুজনের কথাবার্তা ওরা কিছুই বুঝতে পারল না।

রবিন: ওরা কী বলছে?

সর্দার: ছেলেটার গলায় সাপ দেখে তোমরা ভয় পেয়েছ বলে, ওর বাবা ওকে বলেছে এভাবে মানুষকে ভয় দেখালে মা মনসা রাগ করবেন।

রবিন: কিন্তু আমি তো ওদের একটা কথাও বুঝলাম না!

সর্দার: আমাদের নিজেদের ভাষা হলো 'ঠার' ভাষা। ওরা ওই ভাষায় কথা বলেছে বলে তোমরা কিছু বুঝতে পারোনি।

ওরা আরও কিছুক্ষণ গল্প করল। মিলি ওখানে দাঁড়ানো বেদে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলল।

হঠাৎ একজন বয়স্ক নারী মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। কয়েকজন তাকে ধরে ফেলল। বেদে দলের সবার মধ্যেই একটা ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। চার-পাঁচজন মিলে তাকে কোলে তুলে রাখল। কেউ পানি আনছে, কেউ বাতাস করছে। একজন নারী বলছেন, তুমি কদিন ধরে এত অসুস্থ! তোমাকে বললাম, নৌকায় শুয়ে থাকতে, আমি একটুখানি দেখেই ফিরে আসছি। তাও কথা শুনলে না! এখন তোমার ছেলে-মেয়েরা কাজ থেকে ফিরে আমাকে কী বলবে বলো তো! সর্দার ভির ঠেলে সামনে এগিয়ে এলেন। সবাইকে শান্ত হয়ে সরে দাঁড়াতে বললেন। ওরা সবাই সর্দারের কথামতো একটু সরে দাঁড়াল, কিন্তু কেউ চলে গেল না। সবার চোখমুখে উৎকণ্ঠা। সর্দার বললেন, "চৌরানি বেগমকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। " দুজনকে পাঠালেন ভ্যান ডেকে আনতে। আরও দুজনকে বললেন, চৌরানি বেগমের দু'একটা কাপড়, পানি আর শুকনা খাবার নিয়ে আসতে। সবাই ধরাধরি করে ভদ্রমহিলাকে ভ্যানে তুলল। তার সঙ্গে দুজন ভ্যানে চড়ে বসল। আরও দুই-তিনজন ভ্যানটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। আরও বেশ কিছু মানুষ ভ্যানের পেছন পেছন হেঁটে যেতে লাগল।

শিহান বলল, তাঁর ছেলে-মেয়েকে খবর দিতে হবে না!

বেদের দলের ওদেরই বয়সী একটা মেয়ে অবাক হয়ে বলল, আমরা এতজন আছি, সর্দার আছেন, ছেলে-মেয়েকে আলাদা করে জানাতে হবে কেন!

বয়সে বড় আর একটি ছেলে বুঝিয়ে বলল, আসলে আমাদের এখানে সবার সুখ-দু:খই সবাই ভাগ করে নিই। একজনের বিপদে সবাই এগিয়ে আসে। আমাদের সর্দার সবার অভিভাবক। তিনি আমাদের পরামর্শ, নির্দেশ দেন, আমরা সেগুলো মেনে চলি। নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধ হলে সর্দারই সালিশ করে মীমাংসা করে দেন।

ওরা আরও কিছুক্ষণ সেখানে থাকল। ঘুরে ঘুরে নৌকাগুলোর ভেতরেও দেখল। এতটুকু নৌকায় ওদের সংসারের সমস্ত জিনিসপত্র কী সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে!

বেড়ানো শেষে খুশি আপা ওদের নিয়ে ক্লাসে চলে এলেন।

বেদে দলের বৈশিষ্ট্য

ক্লাসে ফিরে খুশি আপা জানতে চাইলেন, আমরা যে বেদের বহর দেখে এলাম তোমাদের কেমন লাগল?

ওরা জানাল যে, ওদের সবারই খুব ভালো লেগেছে।

খুশি আপা: কেন ভালো লাগল বলো তো?

সাবা: বেদে জীবন আমার কাছে দারুণ রোমাঞ্চকর মনে হয়েছে! কেমন ঘরবাড়ি সঙ্গে নিয়ে নদীতে নদীতে সারা জীবন ঘুরে বেড়ায়!

বুশরা: আমরা বছরে দু'একবার বেড়াতে যাই, অথচ ওরা সারা বছর বেড়ায়!

গৌতম: ওরা যে একজনের বিপদে সবাই ছুটে আসে, যেন এতগুলো মানুষের একটাই পরিবার; এই বিষয়টা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে।

রূপা: ওদের কী আশ্চর্য সাহস! সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখায়! এমনকি ওদের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত সাপ নিয়ে খেলছে!

খুশি আপা: তোমরা তো অনেক কিছু লক্ষ করেছ! তাহলে চলো এবার আমরা বেদের বহরে কী কী উল্লেখযোগ্য বিষয় দেখেছি তার একটা তালিকা তৈরি করি। কাজটি আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে করব।

ওরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কাজটি করল। কাজ শেষে প্রতিটি দল নিজেদের তালিকা পড়ে শোনাল। একই বিষয় যেখানে একাধিক দলের তালিকায় এসেছে সেগুলোকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হলো। একটি দলের তালিকায় সেটি রেখে বাকি দলগুলো থেকে বাদ দেওয়া হলো।

এরপর খুশি আপা বললেন, এবার আমরা প্রত্যেকটা বিষয় আলাদা আলাদা কাগজে, সংক্ষেপে, বড় বড় করে লিখব। খুশি আপা প্রতিটি দলকে টুকরো টুকরো রঙিন কাগজ দিলেন। ক্লাসরুমে একটি বড় পোস্টার পেপার টাঙিয়ে দেওয়া হলো। সবার লেখা শেষে সবগুলো দলের লেখা কাগজ পোস্টার পেপারে ওপর থেকে নিচে ধারাবাহিকভাবে সাঁটানো হলো।

খুশি আপা বললেন, আমরা তালিকায় যে বিষয়গুলো রেখেছি সেগুলো থেকে বেদে দলের কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কি খুঁজে পাচ্ছি? ওরা বলল, প্রতিটি বিষয় থেকেই বেদে দলের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলোর নাম ঠিক করে প্রতিটি দল তাদের দেখা বিষয়বস্তুর পাশে বৈশিষ্ট্যের নাম লিখে দিয়ে গেল। এভাবে সবগুলো দলের তালিকা একত্র করে একটা নতুন তালিকা তৈরি হলো।

তালিকাটি দেখতে অনেকটা এ রকম হলো।

যা দেখেছি	বৈশিষ্ট্য
পঁচিশটি পরিবারের একটি দল	একদল মানুষ
ওরা নিজেদের 'বেদে' হিসেবে পরিচয় দেয়	স্বকীয়তার বোধ
একের সমস্যাকে সবার সমস্যা হিসেবে দেখে, একসঙ্গে সমাধান করে	একাত্মতার বোধ
নিজেদের মধ্যে আলাদা ভাষায় কথা বলে। সবাই বাংলা ভাষাও বলতে পারে	

সম্প্রদায়

তালিকা তৈরি শেষ করে খুশি আপা বোর্ডে 'সম্প্রদায়' কথাটা লিখলেন। তারপর বললেন, আমরা এতক্ষণ বেদে দলের যে বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পেলাম, মানুষের কোনো দলের মধ্যে যদি এ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহলে আমরা সেই দলটাকে একটা 'সম্প্রদায়' বলি।

মাহবুব: তাহলে তো আমরা বেদেদের একটা 'সম্প্রদায়' বলতে পারি।

খুশি আপা: অবশ্যই পারি। বেদেদের মতো আমরাও প্রত্যেকে কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের সদস্য। একজন মানুষ অনেকগুলো সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারে। তবে জেনে রাখি:

বেদে সম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখেছি, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তার সবগুলো নাও থাকতে পারে অথবা আলাদা রকমের কোনো বৈশিষ্ট্যও থাকতে পারে। সম্প্রদায়ের আবার নানান ধরন হয়। তবে সম্প্রদায় হতে গেলে একটি দলের সদস্যদের মধ্যে স্বকীয় পরিচয়ের বোধ, একাত্মতার বোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা খুব জরুরি।

আয়েশা বলল, সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমাদের ক্লাসেরও অনেক মিল আছে। তাহলে তো আমাদের ক্লাসটাও একটা সম্প্রদায়! শফিক বলল, আমার প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলে আমার যে সমাজ সেখানেও সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি। আনাই বলল, আমাদের বাড়ি খাগড়াছড়িতে। সেখানে আশপাশের সবার সঙ্গে আমার অনেক বেশি মিল— ভাষা, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ধর্ম....। কিন্তু আমরা এখানে থাকি। এখানকার মানুষের সঙ্গেও অনেক বিষয়ে মিল খুঁজে পাই। তাহলে তো আমার দুটো প্রতিবেশী সম্প্রদায়। সুমন, জামাল, অন্বেষা, গণেশ আরও কিছু কথা বলল। তাতে দেখা গেল ওরা নিজেদের নানা রকমের সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে।

আমার সম্প্রদায়

খুশি আপা বললেন, আমরা একটা মজার খেলা খেলি চলো!

তালিকা থেকে পাওয়া সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা আলাদা কাগজে লিখে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জায়গায় সাঁটিয়ে দেওয়া হলো।

এবারে খুশি আপা প্রতিবেশীদের নিয়ে তার যে সম্প্রদায়, সেটির যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে স্পষ্ট করে বোঝা যায়, প্রত্যেককে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন।

সবাই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর খুশি আপা হাততালি দিয়ে বললেন, বাহ! আমরা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো চমৎকারভাবে বুঝতে পেরেছি! নিজের সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকেও চিহ্নিত করতে পেরেছি।

নতুন পরিচয়

পরের ক্লাসে খুশি আপা একজন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, ইনি ছোটবেলায় তোমাদের স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। আজ এসেছেন, নিজের স্কুলটা দেখতে। সুমন জানতে চাইল, আপনার নাম কী? তিনি বললেন, আমার নাম শরীফা আকতার।

শরীফা

শরীফা বললেন, যখন আমি তোমাদের স্কুলে পড়তাম তখন আমার নাম ছিল শরীফ আহমেদ। আনুচিং অবাক হয়ে বলল, আপনি ছেলে থেকে মেয়ে হলেন কী করে? শরীফা বললেন, আমি তখনও যা ছিলাম এখনও তাই আছি। নামটা কেবল বদলেছি। ওরা শরীফার কথা যেন ঠিকঠাক বুঝতে পারল না।

আনাই তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কোথায়? শরীফা বললেন, আমার বাড়ি এখান থেকে বেশ কাছে। কিন্তু আমি এখন দূরে থাকি। আনাই মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি, আমার পরিবার যেমন অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছে, আপনার পরিবারও তেমন এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। শরীফা বললেন, তা নয়। আমার পরিবার এখানেই আছে। আমি তাদের ছেড়ে দূরে গিয়ে অচেনা মানুষদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছি। এখন সেটাই আমার পরিবার। শরীফা নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করলেন।

শরীফার গল্প

ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে। আমি মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালোবাসতাম। কিন্তু বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দের পোশাক কিনে দিতে রাজি হতো না। মায়ের সঙ্গে ঘরের কাজ করতে আমার বেশি ভালো লাগত। বোনদের সাজবার জিনিস দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সাজতাম। ধরা পড়লে বকাঝকা, এমনকি মারও জুটত কপালে। মেয়েদের সঙ্গে খেলতেই আমার বেশি ইচ্ছে করত। কিন্তু মেয়েরা আমাকে খেলায় নিতে চাইত না। ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গেলেও তারা আমার কথাবার্তা, চালচলন নিয়ে হাসাহাসি করত। স্কুলের সবাই, পাড়া-পড়শি এমনকি বাড়ির লোকজনও আমাকে ভীষণ অবহেলা করত। আমি কেন এ রকম একথা ভেবে আমার নিজেরও খুব কষ্ট হতো, নিজেকে ভীষণ একা লাগত।

এক দিন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো যাকে সমাজের সবাই মেয়ে বলে কিন্তু সে নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে। আমার মনে হলো, এই মানুষটাও আমার মতন। সে আমাকে বলল, আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম 'ট্রান্সজেন্ডার'। সেই মানুষটা আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে নারী-পুরুষের বাইরে আরও নানা রকমের মানুষ আছেন। তাদের বলা হয় 'হিজড়া' জনগোষ্ঠী। তাদের সবাইকে দেখেশুনে রাখেন তাদের 'গুরু মা'। আমার সেখানে গিয়ে নিজেকে আর একলা লাগল না, মনে হলো না যে আমি সবার চেয়ে আলাদা। সেই মানুষগুলোর কাছেই থেকে গেলাম। এখানকার নিয়ম-কানুন, ভাষা, রীতি-নীতি আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক আলাদা। তবু আমরা সবার সুখ-দু:খ ভাগ করে নিয়ে একটা পরিবারের মতনই থাকি। বাড়ির লোকজনের জন্যও খুব মন খারাপ হয় কিন্তু তারা আমাকে আর চায় না, আশপাশের লোকের কথায়ও তাদের ভীষণ ভয়।

আজ থেকে বিশ বছর আগে বাড়ি ছেড়েছি। সেই থেকে আমি আমার নতুন বাড়ির লোকদের সঙ্গে, নতুন শিশু আর নতুন বর-বউকে দোয়া-আশীর্বাদ করে পয়সা রোজগার করি। কখনও কখনও লোকের কাছে চেয়ে টাকা সংগ্রহ করি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছে করে সমাজের আর দশটা স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন কাটাতে, পড়াশোনা, চাকরি-ব্যবসা করতে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ আমাদের সঙ্গে মিশতে চায় না, যোগ্যতা থাকলেও কাজ দিতে চায় না।

আমাদের মতো মানুষ পৃথিবীর সব দেশেই আছে। অনেক দেশেই তারা সমাজের বাকি মানুষের মতনই জীবন কাটায়। তবে আমাদের দেশের অবস্থারও বদল হচ্ছে। ২০১৩ সালে সরকার আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য কাজ করছে। শিক্ষার ব্যবস্থা করছে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রচেষ্টা নিচ্ছে। নজরুল ইসলাম ঋতু, শাম্মী রানী চৌধুরী, বিপুল বর্মণের মতো বাংলাদেশের অনেক ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ সমাজজীবনে এবং পেশাগত জীবনে সাফল্য পেয়েছেন।

জনাব নজরুল ইসলাম রিতু
হিজড়া সম্প্রদায় থেকে প্রথম নির্বাচিত
ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

জনাব রানী চৌধুরী,
উন্নয়ন কর্মী, বেসরকারী সংস্থা এবং
জাতীয় পর্যায়ের নৃত্য শিল্পী

জনাব লিনিয়া শাম্মী
বিউটিশিয়ান এবং উন্নয়ন কর্মী

জনাব বিপুল বর্মণ
ঢাকার একটি বায়িং হাউজে কর্মরত।

নতুন প্রশ্ন

ওরা এত দিন জানত, মানুষ ছেলে হয় অথবা মেয়ে হয়। এখানেও যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, সে কথা ওরা কখন শোনেনি, ভাবেওনি। কিন্তু শরীফা আলাদা রকম বলে সবাই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, এমনকি তার পরিবারের লোকেরাও! শরীফার জীবন-কাহিনি শুনে সবার মন এমন বিষাদে ডুবে গেল যে তাকে আর বেশি প্রশ্ন করতেও ইচ্ছে করল না।

গণেশ, রনি, অন্বেষা, ওমেরা আর নীলা সেদিন বাড়ি ফেরার পথে গল্প করছিল:

গণেশ: তাহলে ছেলে এবং মেয়ে ছাড়াও ভিন্ন রকমের মানুষও হয়।

রনি: আমার মা বলেন, ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।

অন্বেষা: আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আমাদের সময় ছেলে বা মেয়েদের পোশাক, আচরণ, কাজকর্ম যেমন দেখি, প্রাচীন মানুষেরও কি তেমন ছিল? সামনের সময়েও কি এমনটা থাকবে?

রফিক: পৃথিবীর সব দেশে, সকল সম্প্রদায়ে কি ছেলে-মেয়ের ধারণা, তাদের চেহারা, আচরণ, সাজপোশাক একই রকম?

নীলা: আমার মা আমাকে বেগম রোকেয়ার লেখা একটা গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। গল্পটার নাম ‘সুলতানার স্বপ্ন’। সেখানে এমন একটা জায়গা কল্পনা করা হয়েছে যেখানে ছেলে আর মেয়েদের প্রচলিত ভূমিকা উল্টে গিয়েছে।

চলো, আমরাও নারী-পুরুষের ধারণা, সমাজে তাদের ভূমিকা আর নিজেদের ভাবনা সম্পর্কে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করি।

ছেলেদের জিনিস-মেয়েদের জিনিস

পরের দিনের ক্লাসে খুশি আপা টেবিলে কিছু খেলনা, সাজগোজের জিনিস আর পোশাকের ছবি রাখলেন। ক্লাসের সবাইকে ছেলেদের আর মেয়েদের দুটো দলে ভাগ হয়ে যেতে বললেন। তারপর বললেন, তোমরা এখান থেকে ছেলেদের আর মেয়েদের জিনিসের ছবিগুলো বেছে নাও।

খুশি আপা দুটো দলের কাছেই জানতে চাইলেন, তোমরা ছেলেদের এবং মেয়েদের জিনিসগুলো ঠিকঠাক বেছে নিয়েছ তো? প্রতিটি দলই 'হ্যাঁ' বলল। খুশি আপা বললেন, দুটো দলই স্কুলব্যাগ নিয়েছ দেখছি! কিন্তু একটা স্কুলব্যাগ নিয়ে টানাটানি করোনি। দুটো দল একদম আলাদা করে দুটো স্কুলব্যাগ পছন্দ করেছ। দলের মধ্যে কোনো মতবিরোধ হয়নি। এটা কেমন করে হলো? সুমন বলল, কারণ দুটো স্কুলব্যাগ দুই রঙের। একটা ছেলেদের রঙের আর একটা মেয়েদের রঙের। খুশি আপা প্রশ্নের ভঙ্গিতে তাকালেন। সালমা বুঝিয়ে বলল, ছেলেরা নীল রং পছন্দ করে তাই ওরা নীলটা নিয়েছে, আর মেয়েরা গোলাপি পছন্দ করে বলে আমরা গোলাপিটা নিয়েছি। খুশি আপা বললেন, আমার পছন্দের রং নীল। যে শাড়িটা পরে আছি, সেটাও নীল রঙের। তাহলে আমার পছন্দ ছেলেদের মতো বলছ? ওরা একটু থমকে গেল। সিয়াম আমতা আমতা করে বলল, না আপা। ঠিক তা নয়....

খুশি আপা বললেন, ক্লাসের মেয়ের দল কেউ ফুটবল, ক্রিকেট নিয়ে টানাটানি করল না, আপসেই ছেলেদের দিয়ে দিল! কেন? জামাল বলল, কারণ মেয়েরা এই খেলাগুলো খেলতে পছন্দ করে না। আনাই বলল, মোটেই না। বাংলাদেশের মেয়েরা খুব ভালো ক্রিকেট আর ফুটবল খেলছে। সারা পৃথিবীর মেয়েরাই খেলছে। বুশরা

বলল, তাহলে তোরা এগুলো নিলি না কেন? সাবা বলল, ছেলেরা তো শেফ হয়, মেকআপ আর্টিস্টও হয়। তোরা তাহলে রান্নাবাটি আর মেকআপের খেলনা নিলি না কেন?

খুশি আপা তখন বললেন, কয়েকটা প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা চিন্তার খোরাক পেতে পারি। ওরা সবাই মিলে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করল।

- আমরা নিজেদের ছেলে এবং মেয়ে বলে আলাদা করে চিনি কীভাবে?
- ছেলে বা মেয়ে হিসেবে আমরা আমাদের পছন্দের পোশাক, রং, খেলনা, কাজগুলো কী নিজেরাই পছন্দ করি?
- ছেলেদের খেলনা-মেয়েদের খেলনা, ছেলেদের কাজ-মেয়েদের কাজ কীসের ভিত্তিকে নির্দিষ্ট করি?

একজন মানুষকে বাইরে থেকে দেখেই কি সব সময় সে ছেলে না মেয়ে তা বোঝা যায়?

- অন্যরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে তা আমাদের লিঙ্গগত পরিচয়কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
- এমনটা কি হতে পারে যে, কাউকে আমরা তার শরীর বা চেহারা দেখে, গলার স্বর শুনে ছেলে বা মেয়ে বলে ভাবছি কিন্তু সে নিজেকে ভিন্ন কিছু ভাবছে?

লিঙ্গ বৈচিত্র্য ও জেন্ডারের ধারণা

আলোচনা করতে করতে একসময়ে হাচ্চা বলল, আমার মনে হচ্ছে, আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়। মামুন বলল, তাই তো! আমরা

শরীফার জীবনের গল্প শুনলাম, যিনি দেখতে ছেলেদের মতন, কিন্তু মনে মনে তিনি একজন মেয়ে। তার কাছে এমন একজনের কথা জানলাম, যিনি দেখতে মেয়েদের মতো কিন্তু মনে মনে তিনি ছেলে।

খুশি আপা: আমরা চারপাশে দেখে এবং অন্যদের কাছে শুনে জেনেছি যে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটা নির্দিষ্ট ধরনের হলে সে ছেলে হয়, অন্য আরেকটা ধরনের হলে সে মানুষটা মেয়ে হয়। ছেলেদের গলার স্বর মোটা, মেয়েদের চিকন। মেয়েরা ঘরের কাজ বেশি করে, ছেলেরা বাইরে বেশি থাকে। মেয়েরা সাজগোজ করে, তাদের লজ্জা বেশি, তাদের মন নরম হয়। ছেলেরা সাজগোজ করে না, লজ্জা কম পায়, তারা কাঁদেও না। আমরা এগুলোকেই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিচ্ছি।

ফাতেমা: কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ছেলে-মেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বত:সিদ্ধ নিয়ম নেই।

খুশি আপা: ঠিক বলেছ!

সুমন: আমার মনে হচ্ছে, আমরা যেমন করে ভাবছি, অনেকেই তার চেয়ে ভিন্ন রকম করে ভাবে।

সাবা: কিন্তু সবার তো নিজের মত, নিজের অনুভূতি, নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের স্বাধীনতা আছে!

খুশি আপা: যতক্ষণ না তাতে অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই আছে।

শিহান: তাহলে শরীফা আপারা কার কী ক্ষতি করেছেন?

খুশি আপা: একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজ যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা 'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে সমাজের প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

হিজড়া জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়

কাজ শেষে গৌতম বলল, আচ্ছা আমাদের দেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের কি আমরা একটি 'সম্প্রদায়' বলতে পারি? খুশি আপা বললেন, আমরা সম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়েছি সেগুলোর সঙ্গে এদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীর মিল-অমিল পরীক্ষা করে দেখলেই বিষয়টা বুঝতে পারব।

খুশি আপা নিচের ছকটি বোর্ডে আঁকলেন। তারপর সবার সঙ্গে আলোচনা করে টিক চিহ্ন দিলেন।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য	মিল আছে	মিল নেই
একদল মানুষ		
স্বকীয়তার বোধ		
একাত্মতার বোধ		

কাজ শেষ করে দেখা গেল, সম্প্রদায়ের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য হিজড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং তারা সবাই মিলে বুঝতে পারল যে, বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে একটি সম্প্রদায় বলা যায়।

সালমা বলল, আমরা তো একটা চমৎকার 'টুল' তৈরি করে ফেলেছি! অরোরিন বলল, এই টুলটা ব্যবহার করে আমরা যে কোনো সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করতে পারব।

এবারে আমরাও আমাদের টুল ব্যবহার করে উপরের ছকটি পূরণ করি।

পেশাজীবী সম্প্রদায়

রূপা বলল, একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছ? রনি বলল, স্কুলের পেছন দিক থেকে গন্ধটা আসছে। ফ্রান্সিস জানাল, বাজারের পাশেই একটা বড় ডাস্টবিন আছে। ওই পথে ওকে স্কুলে আসতে হয়। আজ আসার সময় দুর্গন্ধে ওর প্রায় বমি চলে এসেছিল। লোকজনকে বলাবলি করতে শুনেছে, দুদিন ধরে পরিচ্ছন্নতাকর্মী আসেনি। আরও দুদিন যদি তারা না আসে তাহলে বাজারে আর কেউ ঢুকতেই পারবে না। নীলা বলল, আমার চাচা একবার খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন দেখেছি, পরিচ্ছন্নতাকর্মীর আসতে দেরি হয়েছে বলে অপারেশন করতেও অনেক দেরি হয়েছিল। মামুন বলল, পরিচ্ছন্নতাকর্মী কি অপারেশন করে নাকি? নীলা বলল, তা কেন! কিন্তু অপারেশন করার আগে অপারেশন থিয়েটার পরিষ্কার করতে হয়। মামুন বলল, তাই তো! হাসপাতাল শুনলেই মনে হয় সেখানে ডাক্তার আর নার্স খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তারা না এলে মানুষ চিকিৎসা সেবা পাবে না। কিন্তু হাসপাতালে রোগীর সেবায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীও তো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন! আদনান

বলল, যদি পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কাজ করা বন্ধ করে দেয় তাহলে তো পৃথিবীর যত জায়গায় মানুষ আছে, সব জায়গাই নোংরায় ভরে যাবে।

খুশি আপা শ্রেণিকক্ষে আসার পর সবাই তাঁকে জানাল যে, পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা যে সকলকে কত সাহায্য করেন, তা আজকের এই দুর্গন্ধের কারণে ওরা বুঝতে পেরেছে। খুশি আপা ওদের কথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

আনাই জানতে চাইল, আপা, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদেরও কি আমরা একটা সম্প্রদায় বলতে পারি? খুশি আপা বললেন, নিশ্চয়ই পারি। বংশানুক্রমে যারা সুনির্দিষ্ট পেশায় কাজ করে তাদের এক একটি আলাদা সম্প্রদায় তৈরি হয়। আমাদের দেশে হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষরা সাধারণত পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করে। যাদের নিজস্ব ভাষা, স্বতন্ত্র জীবনধারা আছে। আবার পেশা বংশানুক্রমিক না হলেও পেশার ভিত্তিতে এক একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় তৈরি হয়। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পেশাজীবী সম্প্রদায়ও কিন্তু আমাদের সাহায্য করেন।

চলো আমরা প্রত্যেকে টুল ব্যবহার করে আমাদের আশপাশের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করি। কাজটি আমরা অনুসন্ধানী কাজের ধাপ অনুসরণ করে করব। এরপর ওরা তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন তৈরি করল, তারপর তথ্য সংগ্রহ করে, বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করল।

আমরাও ওদের মতো করে আমাদের টুল ব্যবহার করে, অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে আমাদের আশপাশের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করি।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের পেশাজীবী সম্প্রদায়

খুশি আপা বললেন, আমাদের দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো তো খুঁজে বের করলাম, এবার বিশ্বের অন্যান্য দেশের পেশাজীবী সম্প্রদায়গুলোর বৈশিষ্ট্যও ইন্টারনেট, বই, পত্রিকা ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে খুঁজে বের করি। আমাদের পরিবারের, আশপাশের বা পরিচিত কেউ বিদেশে থাকলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

ওরা এবারও নিজেদের তৈরি টুল ব্যবহার করে, অনুসন্ধানী কাজের ধাপ অনুসরণ করে তথ্য উপস্থাপন করল।

চলো, আমরাও আমাদের টুল ব্যবহার করে, অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করি।

পারস্পরিক সহযোগিতা

খুশি আপা শিহানকে বললেন, তুমি কি আমাকে ওই কলমটা একটু দেবে? শিহান খুশি আপাকে কলমটা দেওয়ার পর খুশি আপা তাকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর সবাইকে বললেন, শিহান আমাকে সাহায্য করেছে বলে আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। অর্থাৎ কেউ আমাদের সাহায্য করলে বিনিময়ে আমরাও কিছু করি। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, আমরা তো পেশাজীবী সম্প্রদায়কে নিয়ে অনেক কাজ করলাম, আমাদের চারপাশে যেসব পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন, যারা নানাভাবে সমাজের সেবা করেন, আমাদের প্রয়োজনে কাজ করেন, তাদের অবদান আমরা কি বুঝতে পারি? আয়েশা বলল, পারি। খুশি আপা বললেন, চমৎকার! তাহলে চলো, এই ছকটা ব্যবহার করে ছোট্ট একটা পরীক্ষা করি। আমরা প্রত্যেকে এই ছকটা পূরণ করব।

আমার আশপাশের পেশাজীবী	আমি তার কাছে যে সাহায্য পাই	আমি তাকে যেভাবে সাহায্য করি
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

আমরাও ছক পূরণের কাজটি করি।

ছক পূরণ করতে গিয়ে কেউ কেউ জানতে চাইল, ‘আমি তাকে যেভাবে সাহায্য করি’ এই ঘরটায় কী লিখব? সালমা বলল, আজ সকালে আমি রিকশায় চড়ে স্কুলে এসেছি। রিকশাওয়ালা আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন, বিনিময়ে আমি তাকে টাকা দিয়েছি। আমি কি সেটাই লিখব? তখন ক্লাসের অন্যান্যরাও বলল, তারাও বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে পেশাজীবীদের টাকা দেয়।

খুশি আপা: সেবার মূল্য কি কেবল টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যায়? ধরো, আজ সকালে সালমা যদি একটাও রিকশা না পেত, তাহলে ও কী করত? অথবা যদি সেই রিকশাওয়ালা ওকে পৌঁছে দিতে রাজি না হতো, তাহলে টাকা ওর কী কাজে লাগত?

রনি: আমরা তাহলে সেবার বিনিময়ে টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধন্যবাদও জানাতে পারি।

খুশি আপা: নিশ্চয়ই পারি।

নীলা: আমাদের বাড়িতে যিনি কাজে সাহায্য করেন, তার মেয়েকে আমি আমার একটা জামা দিয়েছিলাম।

রূপা: বাড়ির অদরকারি জিনিসপত্র আমরা যাদের দরকার তাদের দিই।

মাহবুব: আমার বাবা-মা অনেককে অনেক সাহায্য করেন।

বুশরা: কিন্তু কেউ আমাকে সাহায্য করছেন, তার জন্যও আমার কিছু করার আছে, এভাবে কখনও ভেবে দেখিনি। অথচ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সাহায্য ছাড়া আমরা চলতে পারি না!

খুশি আপা: জীবন যাপনের জন্য দরকারি সব কাজ একা কেউ করতে পারে না। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতায় সমাজ টিকে থাকে।

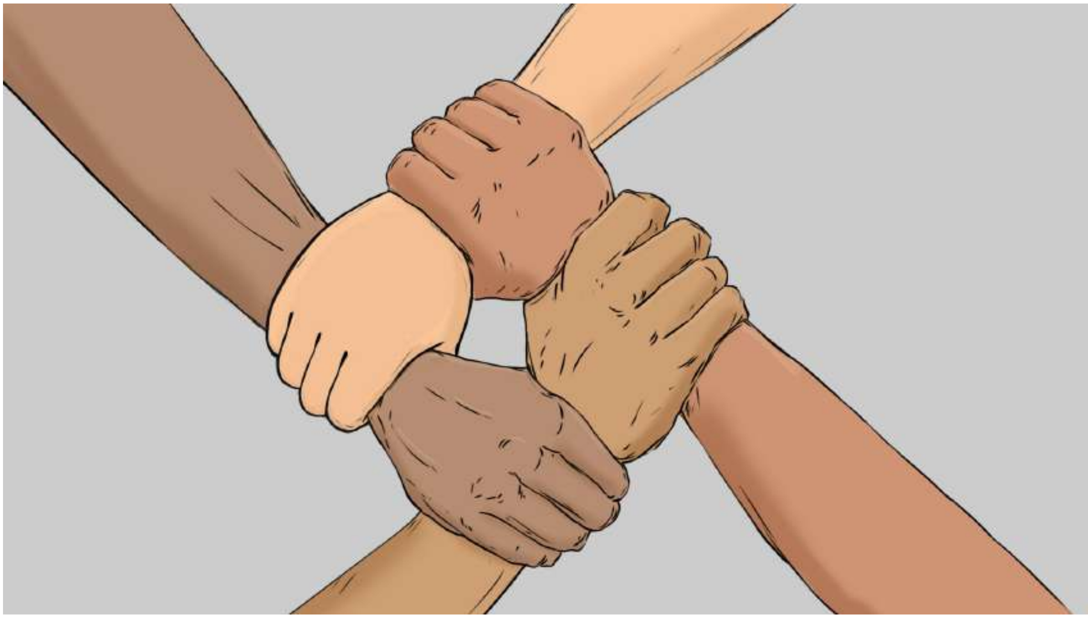

আমরা যাদের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছি, তাদের জন্য আমদের কী করণীয়, চলো ভেবে বের করি এবং তালিকা তৈরি করি। কাজটি আমরা সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী করব এবং নিজেদের আচরণেও প্রয়োগ করব। তালিকা থেকে দলে করানোর জন্য আমরা কিছু কাজ বেছে নেব, আর কিছু কাজ এককভাবে করব।

ওরা সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের সহযোগিতা করার জন্য সম্ভাব্য কাজের একটি তালিকা তৈরি করল:

- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের এক দিন বিশ্রাম করতে দিয়ে সপ্তাহে এক দিন বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন করা
- কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জৈব সার, প্রাকৃতিক কীটনাশক সম্পর্কে জানানো
- দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা, নতুন বা পুরোনো বই, শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ইত্যাদি দেওয়া
- আশপাশের সম্প্রদায়ের বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে গল্প করা, তাদের বই, পত্রিকা পড়ে শোনানো
- ব্যাংকে জমানো টাকা দিয়ে শীতবস্ত্র দেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পরিবারগুলোকে সহায়তা দেওয়া

এরপর ওরা দলীয় এবং একক কাজের হিসাব রাখার জন্য একটা ছক তৈরি করল।

দলীয় কাজ	প্রত্যক্ষ							
একক কাজ	পরোক্ষ							

ওরা তালিকা অনুযায়ী বছরব্যাপী আশপাশের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদের সহযোগিতা করল এবং তা ছকে লিখে রাখল। বছর শেষে ওদের কাজগুলোর মূল্যায়ন হলো।

চলো, আমরাও সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের সহযোগিতা করার জন্য সম্ভাব্য কাজের একটি তালিকা তৈরি করি। দলীয় এবং একক কাজের হিসাব রাখার জন্য একটা ছক তৈরি করে তাতে আমাদের কাজগুলোর কথা লিখে রাখি।

মুক্তিযুদ্ধের দেশি ও বিদেশি বন্ধুরা

মামুন আজ ক্লাসে এসে ওর বন্ধুদের বলল সে এবার ইদের বন্ধে মা বাবার সাথে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বেড়াতে গিয়েছিল। জাদুঘরে তারা মাদার তেরেসাসহ আরো কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের ছবি দেখেছে, যারা বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ সাংবাদিক, কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ বা সমাজকর্মী ছিলেন।

মিলি বলল, তাই নাকি! তোমার কথা শুনে আমারও তাদের দেখতে ইচ্ছে করছে।

এমন সময় খুশি আপা ক্লাসে প্রবেশ করে তাদের কাছে জানতে চাইলেন তারা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছে।

মিলি বলল, আপা মামুন এবারের ছুটিতে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে ও অনেক বিখ্যাত মানুষের ছবি দেখেছে, যারা বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সাহায্য করেছিলেন। ওর কথা শুনে আমাদেরও সে সব বিখ্যাত মানুষ দেখতে ইচ্ছা করছে।

খুশি আপা বললেন, তাই! তাহলে চলো আমরা এ রকম কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের ছবি দেখি।

সাইমন ড্রিং

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

মাদার তেরেসা

লিওনিদ ব্রেজনেভ

শরণার্থী শিবিরে এডওয়ার্ড কেনেডি

জর্জ হ্যাঁরিসন

পন্ডিত রবিশংকর

তাজউদ্দীন আহমদ

খুশি আপা যখন শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলেন ছবির ব্যক্তিদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কী তখন দেখা গেল ওরা আন্দাজ করে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে পারলেও বিস্তারিত তেমন কিছু জানে না।

খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে এসব বিখ্যাত মানুষদের মধ্যে থেকে একজনের সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। তার নাম সাইমন ড্রিং। উনি পেশায় ছিলেন একজন সাংবাদিক ।

সাইমন ড্রিং: বাংলাদেশের বন্ধু

সাইমন ড্রিংকে বলা হয় বাংলাদেশের একজন 'প্রকৃত বন্ধু'

১৯৭১ সালে সাইমন ড্রিং ২৬ বছরের একজন তরতাজা তরুণ সাংবাদিক। ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের গণতন্ত্রে উত্তরণের সংকট কীভাবে সমাধান হচ্ছে তার খবর সংগ্রহ করতে। আরও বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি ছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে।

কিন্তু পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানিরা সব বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। পাকিস্তানি সামরি কর্মকর্তারা পাহারা দিয়ে তাদের বিমান বন্দরে পৌঁছে দিচ্ছিল। তরুণ সাইমন আচঁ করতে পেরেছিলেন যে ঢাকায় বড় ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, যা সরকার বিদেশিদের কাছে গোপন করতে চায়। তখনই তিনি ঠিক করলেন যেভাবে হোক খবরটা তার সংগ্রহ করতে হবে।

পাকিস্তানি সামরিক সদস্যদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ড্রিং ৩২ ঘণ্টার বেশি সময় হোটেলে লুকিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই পাকিস্তানের হিংসাত্মক ঘটনার খবর তিনি বিশ্ববাসীকে জানাবেন। ২৭ ঘণ্টা পরে যখন কারফিউ বা সান্ধ্য আইন তুলে নেওয়া হয় তখন তিনি রাস্তায় টহলরত মিলিটারির চোখ এড়িয়ে পথে নামলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পুরোনো ঢাকার কিছু জায়গা থেকে তিনি গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ছবি তুললেন, খবর সংগ্রহ করলেন।

তাঁর আসল কাজ তো হলো, এবার অবরুদ্ধ দেশ থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরোতে হবে, কারণ খবরটা তো বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। নানা কৌশলে, এমনকি তথ্য টুকে রাখা কাগজ, ছবির নেগেটিভ মোজার মধ্যে লুকিয়ে রেখে.কোনো মতে বিমানে উঠে অবরুদ্ধ দেশ ছেড়ে সাইমন ব্যাংকক পৌঁছান।

ব্যাংকক থেকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদন 'পাকিস্তানে ট্যাংকের নিচে বিদ্রোহ দমন' শিরোনাম পাঠিয়ে দেন তাঁর পত্রিকা লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফে। এটি ২৯ মার্চ প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনটির শুরুর বাক্য ছিল এ রকম 'সৃষ্টিকর্তা এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নামে ঢাকা আজ বিধ্বস্ত ও ভয়ার্ত এক শহর। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ঠান্ডা মাথায় বর্বরভাবে কামানের গোলার আঘাতে ঢাকায় এক রাতে অন্তত ৭০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, বিশাল বিশাল এলাকার ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার সংগ্রামকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। '

সে রাতের পরে প্রেতপুরির মতো বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ, স্তুপিকৃত লাশের এক শহর দেখে তাঁর মনে হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম তখনকার মতো শেষ। কিন্তু এই খবর এবং তার সাথের ছবিগুলো বিশ্ববাসীর কাছে এই বাংলায় পাকিস্তানিদের চালানো ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বারতা দিয়েছিল। এটি মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

সাইমন ড্রিং সারা জীবনে ভিয়েতনাম যুদ্ধসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ২০টি যুদ্ধ ও বিপ্লবের খবর সংগ্রহ করে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপিয়ে ছিলেন, টিভিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন। ২০২১ সালে ৭৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাইমনের কাহিনী শেষ করে খুশি আপা বললেন, এ তো একজন সাইমনের কথা হলো। নয় মাসজুড়ে আরও অনেক সাংবাদিক যুদ্ধের সময়কার খবর পাঠিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং টিভি ও রেডিওতে।

এমন সময় ক্লাসের একটু চুপচাপ মেয়ে নীলা বলল, কিন্তু কেবল কি বিদেশি সাংবাদিকরাই আমাদের পক্ষে কাজ করেছিল?

খুশি আপা একটু রহস্য করে হেসে বললেন, তোমাদের কী মনে হয়?

ওরা একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আপার দিকেই তাকিয়ে থাকল।

খুশি আপা হেসে বললেন, দেশি সাংবাদিকরাও দু:সাহসী কাজ করেছেন।

রবিন জিজ্ঞেস করল, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কি সারা বিশ্বেই আলোড়ন ফেলেছিল?

খুশি আপা মাথা নেড়ে বললেন, আমরা একা ছিলাম না। তাছাড়া বিশ্বের একটা অঞ্চলে যুদ্ধ বাধলে পাশের দেশ তো চুপ থাকতে পারে না। এমনকি মানবিক সংকট হলেও তারা নিশ্চুপ থাকতে পারে না।

ওদের এ আলোচনায় জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন (ইউএনএইচসিআর -UNHCR), সেভ দ্য চিলড্রেনসহ আরও কিছু কিছু বিদেশি ও দেশি সংস্থার নাম উঠে আসে। তবে আপা ওদের জানাতে ভুললেন না যে এ রকমই এক কঠিন দু:সময়ে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে ‘মাদার অব হিউম্যানিটি বা মানবতার জননী শিরোপা পেয়েছেন।

যুদ্ধের আরও ফ্রন্ট

খুশি আপা বললেন, তাহলে দেখো যুদ্ধ শুধু সৈনিকরাই করেন না, কেবল অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ হয় না। কেবল রণাঙ্গণেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকে না।

মিলি বলল, আপা সাইমন ড্রিং যেমন তার সংগ্রহ করা খবর লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফপত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন তেমন মুক্তিযুদ্ধের সময় তো আরো অনেক গণমাধ্যমও ছিল।

কণক বলল আমি মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা একটি বই পড়েছিলাম। ওখানে বিবিসি ও আকাশবাণীর নাম পেয়েছিলাম।

এবারে খুশি আপা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলেন যুদ্ধের অন্যান্য ফ্রন্টের নাম।

মিলি বলল, ‘বিবিসি, আকাশবাণী।

ফ্রান্সিস শুধরে নিয়ে বলল’ সংবাদপত্র ও বেতার-টিভি মিলিয়ে বলা যায় গণমাধ্যম।

এভাবে খুশি আপার সাহায্য নিয়ে ওরা সম্ভাব্য ফ্রন্টের একটা তালিকা তৈরি করবে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ কণক। দেখো, যুদ্ধ দুই দেশের মধ্যে বাধলেও উভয় পক্ষেই আরও বন্ধুরাষ্ট্রের সমর্থন সাহায্য প্রয়োজন হয়। যুদ্ধ বা সমস্যা যদি বড় আকারের হয় তখন তার রেশ অঞ্চল ছাপিয়ে বিশ্বেও প্রভাব ফেলে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তেমন একটি ঘটনা ছিল। আমাদের নেতৃবৃন্দও চেয়েছেন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে বন্ধুরাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়াতে।

এ সময় আনুচিং বলল, আমি শুনেছি জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন খুব বড় ভূমিকা পালন করেছিল।

নন্দিনী বাবার কাছে শোনা একটি কথা বলে খুশি আপাকে তাক লাগিয়ে দিল। বলল এ হলো কুটনৈতিক যুদ্ধ।

আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ তুমি, বহু দেশ এবং বহু মানুষের সহযোগিতাই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে নয় মাসে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি। এখানে কুটনীতি এবং রাজনীতি উভয়েরই ভূমিকা আছে।

তখন হারুন একটা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করল। ও বলল আমি শুনেছি চীন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু কেন?

ফ্রান্সিস ও সালমা বলল, তাহলে মুক্তিযুদ্ধ কেবল আমাদের দেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, পৃথিবীর অনেক দেশ, অনেক মানুষ, অনেক প্রতিষ্ঠান এতে যুক্ত হয়েছিল।

এবারে আদনান বলল, এতসব আমরা জানব কীভাবে? রনি বলল, আমরা মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক খবর, বৈশ্বিক খবর, বিভিন্ন ফ্রন্টের খবর সবই জানতে চাই। চলো এ বিষয়ে একটা প্রকল্পমূলক কাজ করা যাক।

খুশি আপা বরাবরই হাসিখুশি মানুষ আর শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। উনি এবার বললেন, তোমরা হলে এক একজন খুদে গবেষক। রীতিমত গবেষকের মতো কাজ করবে তোমরা। যখন সক্রিয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা কোনো সমস্যা সমাধান করি কিংবা কোনো জটিল চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন/বিষয়ের উত্তর খুঁজি তখন প্রকল্পভিত্তিক কাজ করাই ভালো। সাধারণত এ ধরনের কাজগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়। এভাবে অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে যেমন তথ্য জানা যায় তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন/প্রশ্নসমূহের জবাব পাওয়া যায়। আর এভাবে এমন একটা প্রতিবেদন তৈরি হয়ে ওঠে যাতে সব দিকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবার স্পষ্ট ধারণা হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা এ ধরনের কাজের ধাপগুলো সম্পর্কে জেনেছ। সেটা মনে করে বা আরেকবার পড়ে নিয়ে কাজের ধাপগুলো ঠিক করে নাও।

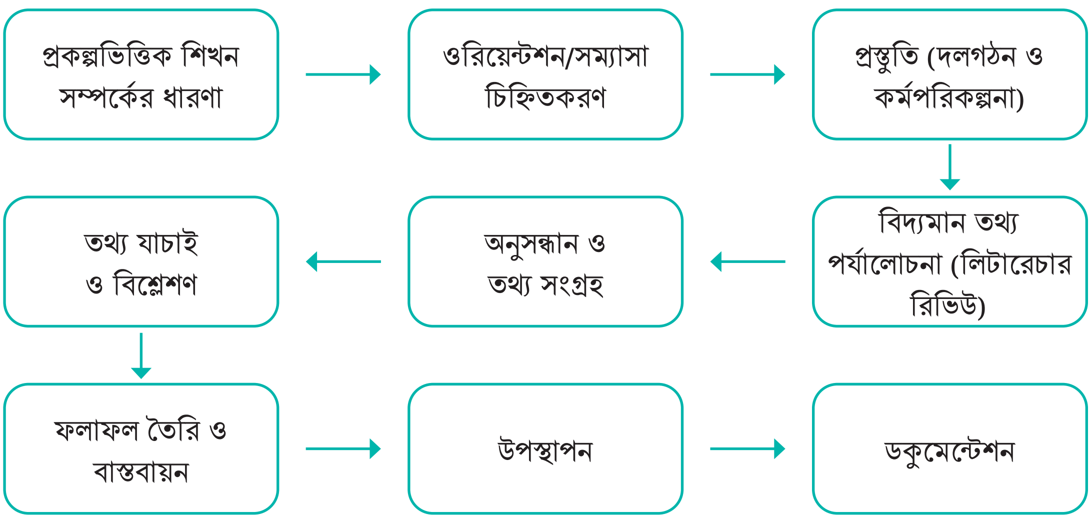

চলো, আমরাও ওদের মতো করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে যারা বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তাদের কথা জেনে নিই।

এবারে খুশি আপা প্রকল্পে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা তাদের আলোচনা করে বের করতে বললেন। আলোচনার মাধ্যমে তারা প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ের তালিকা তৈরি করল।

আনাই ও তার দলের তালিকা:

১. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদিকদের ভূমিকা, (গণমাধ্যম)
২. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকা, (গণমাধ্যম)
৩. শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় মূল ভার বহনকারী দেশ ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভূমিকা। (মানবিক সহায়তা)
৪. প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক। (রাজনীতি)
৫. মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং বিজয় অর্জন পর্যন্ত তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব ও এতে দেশটির অবদান। (রাজনীতি)
৬. জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার ভূমিকা। (কূটনীতি)
৭. সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্র দেশের ভূমিকা। (কূটনীতি)
৮. শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্যোগ (সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র)

শ্রেণির সবাইকে নিয়ে যখন দল ভাগ করা হচ্ছে তখন দীপঙ্কর ও অন্বেষা জানতে চাইল, কোন দল কোন বিষয়ে কাজ করবে সেটা কীভাবে ঠিক করা হবে?

খুশি আপা হেসে বললেন, আবার কীভাবে, সবাই মিলে আলোচনা করেই ঠিক করব, কারও যদি মনে হয় বিষয়টা কঠিন, তাহলে আমরা সবাই তাদের সাহায্য করব। এর মধ্যে শিহান একটা জটিলতার কথা তুলে ধরল। বলল, বায়ান্ন বছর আগেকার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কি সহজে পাওয়া যাবে?

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে যখন তখনই মিলি বলল, প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই বয়স্ক আত্মীয় বা বয়স্ক প্রতিবেশীর সন্ধান নিশ্চয় পাওয়া যাবে। যাঁরা অন্তত কৈশোরে এ যুদ্ধ সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বা জেনেছেন।

তারপর সবাই মিলে তথ্যের উৎস নির্ণয়ের চেষ্টা শুরু করল। তাতে বিভিন্নজন সম্ভাব্য বিভিন্ন উৎসের কথা বলেছে, যেমন

- বয়স্ক আত্মীয় বা প্রতিবেশী বা পরিচিত ব্যক্তি
- পাঠ্য বই
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই

- স্থানীয় লাইব্রেরি
- তখনকার পত্রপত্রিকা
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বিভিন্ন প্রকাশনা
- ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট
- গুগল

এবারে কাজ কীভাবে করা যাবে তার পরিকল্পনা করতে শুরু করল শ্রেণির সবাই মিলে। তারা প্রথমে দল ভাগ করবে, তারপর তৈরি করবে দলভিত্তিক কাজের নিয়মাবলি।

দলভিত্তিক কাজের নিয়ম-নীতি:

১. দলের সক্ষমতার ধরন নির্বিশেষে সবার জন্যে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি
২. দলের প্রত্যেকের মতামতকে মূল্য দিয়ে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন,
৩. নিজের মতামত নির্দ্বিধায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ
৪. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বা নিজের ভিন্নমত প্রদান
৫. সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণ
৬. দীর্ঘ কাজে কোনো লাইব্রেরি বারবার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেভাবে অনুমতি গ্রহণ
৭. কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই, ছবি বা অন্য কোনো নথি ব্যবহার করতে হলে তাঁর অনুমতি গ্রহণ
৮. ব্যবহৃত সব দ্রব্যের যথাযথ যত্ন নেওয়া ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথা সময় ফেরত দেওয়া
৯. দলের সব সদস্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
১০. কাজটি তথ্যে ও বিন্যাসে যেন সমৃদ্ধ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান

বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ)

আজ খুশি আপা জানতে চাইলেন যে এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যেসব ঘটনা ইতোমধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেসব কোথায় পাওয়া যাবে? এর উত্তরে সবাই মিলে যা বলল তা একটা তালিকা করলে দাঁড়ায় বই, পত্রিকা, ডকুমেন্টারি, দলিলপত্র ইত্যাদি। সবাই মিলে আলোচনা করে তখন ঠিক করল যে সবগুলো দল প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্ভাব্য উৎসের তালিকা তৈরি করবে এবং তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্য উৎসের তালিকা, অনুসন্ধান প্রক্রিয়াসহ প্রাপ্ত তথ্যাবলি খুশি আপার সাথে আলোচনা করবে।

বই পড়া ক্লাব গঠন

মিলি বলল, আপা আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে তো বই পড়া ক্লাব করেছিলাম। এখন এসব বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা আমাদের ক্লাবের লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিতে পারি।

কনক বলল কিন্তু আমাদের বই পড়া ক্লাবের মেয়াদ তো শেষ। তাহলে আবার ক্লাবের নির্বাচন করে পুনরায়

কমিটি গঠন করতে হবে।

তখন ওরা সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠনের পদ্ধতি অনুসরণ করে পুনরায় বই পড়া ক্লাব গঠন করল। ক্লাব গঠন শেষ হলে প্রথম দিন থেকেই ওরা বই পড়া ক্লাবের কাজের ধরন এবং পুনরায় সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা তৈরি করল।

তথ্যের সন্ধানে:

কাজটা শুরু করতে হবে তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্যের সম্ভাব্য উৎসগুলোও জানা হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো আরও নতুন কোনো কোনো উৎসও পেয়েছে। কিন্তু কাজটা শুরু করবে কীভাবে?

নন্দিনী ও গণেশ একই দলে। এক ছুটির সকালে গণেশ নন্দিনীদের বাসায় এসে হাজির। বলল সত্যি কাজ কীভাবে শুরু করব সেটা নিয়ে ভেবে কিন্তু কূল পাচ্ছি না। নন্দিনীও বলল, হ্যাঁ, একদম শূন্য থেকে শুরু করা বেশ মুশকিল। নন্দিনীর বাবা তখন ওখানে বসে পত্রিকা পড়ছিলেন। উনি স্থানীয় কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। বললেন, তোমাদের কথা আমি শুনেছি। আসলে যে বিষয়ে তোমরা কাজ করবে প্রথমে সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো বই পড়বে, নির্ভরযোগ্য লেখকের নির্ভরযোগ্য বই। অথবা কোনো নির্ভরযোগ্য মানুষের কাছ থেকে ইতিহাসটা শুনবে।

গণেশ বলল, চাচা, আপনি মনে হচ্ছে নির্ভরযোগ্য শব্দটার ওপর জোর দিচ্ছেন খুব। কেন?

নন্দিনীর বাবা বললেন হ্যাঁ, মুশকিল হয়েছে অনেকেই বই লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু তথ্যগুলো ভালোভাবে যাচাই করে নেন না। কিছু কিছু ভুল থেকে যায়। তাই তোমাদের নির্ভরযোগ্য বই বা ব্যক্তির কথাই বলছি।

তখন নন্দিনী বলল তো আব্বু, তুমি তো ইতিহাস পড়াও, আবার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখিও করো। বাসায় তোমার সংগ্রহে তো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক বই আছে। তুমিই এক দিন আমাদের বলো না কেন মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সাংবাদিক, দেশ-বিদেশের আরও মানুষের ভূমিকা আর অবদানের কথা।

এ সময় গণেশ বলল, চাচা, আপনি দুদিন বললে ভালো হবে। এক দিন বলবেন মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে। আরেক দিন বলবেন এতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্যক্তি ও পক্ষের ভূমিকা, অবস্থান ও অবদান নিয়ে।

শুনে নন্দিনীর বাবা বললেন, ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তোমাদের আগ্রহ দেখে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। আমি তোমাদের স্কুলে যাব।

অমনি গণেশ যোগ করল তাহলে চাচা আমরা এক দিন ক্লাসে আসার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাব।

নন্দিনীর বাবা অধ্যাপক আজিজুল হক একটু ভেবে বললেন, ঠিক আছে। শুনে ওরা দু'জন হৈ হৈ করে আনন্দ প্রকাশ করল।

অধ্যাপক আজিজুল হক সেদিন গণেশ-নন্দিনীদের যেসব কথা বলেছিলেন তা এবার তোমরা সবাই জেনে নিতে পার।

মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

তোমরা তো জানো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশের মানুষ তখন স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সেই ইতিহাস তোমরা অনেকটাই জানো। এ রকম একটা যুদ্ধ আমাদের একার পক্ষে জেতা খুব কঠিন হতো। পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল থেকেছে কারণ আমরা বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে সহায়তা ও সমর্থন পেয়েছিলাম। এটা ঠিক যে কিছু দেশ আমাদের বিরুদ্ধেও ছিল।

স্বাভাবিক মিত্র ভারত: শরণার্থীর ঢল:

১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে এদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা শুরু করেছিল তা থেকে প্রাণ বাঁচাতে প্রথমে হাজার হাজার ও পরে লাখ লাখ মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। বিদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী এই মানুষদেরই বলা হয় শরণার্থী। তারা মূলত আমাদের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। তবে পূর্ব দিকের ত্রিপুরা রাজ্যও হয়ে উঠেছিল একটি বড় আশ্রয়কেন্দ্র। উত্তর-পূর্বের মেঘালয় রাজ্যেও কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। অল্প কিছু মানুষ মিয়ানমারেও আশ্রয় নেন। মুক্তিসংগ্রামের সময় ভারতের রাজধানী দিল্লি রাজনৈতিক কারণে, কলকাতা বাংলাদেশ সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে এবং আগরতলা শরণার্থীদের বড় অংশের ট্রানজিট ও যুদ্ধের প্রস্তুতি ক্যাম্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তখন বাস্তবতাই প্রতিবেশী ভারতকে বাংলাদেশের সংগ্রামে যুক্ত করে নিয়েছিল। এই যোগ ছিল বহুমাত্রিক।

যুদ্ধের পুরো নয়মাস জুড়েই ভারতের দিকে শরণার্থীর ঢল বহমান ছিল। ভারত সেদিন শরণার্থীদের জন্যে সীমান্তের সব পথ খুলে দিয়েছিল, শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের খাবার ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করেছিল। নয় মাসে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটি। মনে রেখো, তখন দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি।

রাজনৈতিক সংযোগ:

তোমরা তো জানো ২৫ মার্চ মধ্যরাতে নিজ বাড়িতে গ্রেপ্তার বরণ করার আগে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রাম যেন এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাজউদ্দীন প্রথমে কয়েক দিন আত্মগোপনে থেকে দলের কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। পাকিস্তানি আক্রমণের প্রায় পরপর ৩১ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে সে দেশের পার্লামেন্ট লোকসভায় বাংলাদেশের অনুকূলে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয় 'আমাদের সীমান্তের এত কাছে যে ভয়াল মৃতুর ঘটনা ঘটছে তার প্রতি এই সংসদ উদাসীন থাকতে পারে না। এই সংসদ প্রত্যয়ের সাথে তাদের জানাতে চায় যে তাদের (বাংলাদেশের জনগণকে) সংগ্রাম ও ত্যাগ ভারতের জনগণের সর্বাত্মক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করবে। ' আর জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সমর সেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উ থান্টকে এক চিঠিতে জানান, 'বাংলাদেশের জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের শোষণ ও অবমাননাকর আচরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে একে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় ভেবে আর চুপ থাকা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিবেচনায় এখানে হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ' এই অবস্থায় যখন তাজউদ্দীন ও তাঁর সঙ্গীরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন। তখন তাঁর কাছ থেকে সহায়তার আশ্বাস পেতে দেরি হয়নি। তাজউদ্দীন যেসব বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছিলেন সেগুলো হলো মুক্তিসংগ্রামে সর্বাত্মক সহযোগিতা, প্রবাসী সরকার গঠনে সহায়তা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত অস্ত্র সহায়তা এবং শরণার্থীদের জন্যে সব রকম মানবিক সাহায্য।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীরপূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস নিয়ে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে তাজউদ্দীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। ভারত সে কাজেও সহযোগিতা দেয়। তোমরা জানো যে সরকার গঠিত হয়েছিল বর্তমান মুজিবনগর, তৎকালীন কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়, ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। তবে সরকারের দপ্তর ছিল কলকাতায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও চট্টগ্রাম, আগরতলা হয়ে কলকাতায় স্থাপিত হয়। এই সময় ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ছিল লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তাই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সরকারও ছিল তাদের। তবে লোকসভায় সক্রিয় ছিল আরও কয়েকটি দল- ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিআই), ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট), ভারতীয় জনতা দল ইত্যাদি। ইন্দিরা গান্ধী সবার মতামত নিয়ে বাংলাদেশ ইস্যুতে একটি শক্তিশালী সর্বসম্মত রাজনৈতিক অবস্থান নেন। এতে বাংলাদেশের জন্যেও কাজ করতে বিশেষ সুবিধা হয়।

সামরিক সহযোগিতা:

ভারত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে শরণার্থী শিবির খোলার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও গোলাবারুদসহ প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল। এভাবে ভারতের সামরিক বাহিনীও বাংলাদেশের সংগ্রামে যুক্ত হয়ে যায়। তারা গেরিলা যোদ্ধা, নিয়মিত বাহিনীর নতুন সদস্য, নৌ কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদেরও ব্যবস্থা করেছে। আমাদের নিয়মিত বাহিনীকে সম্মুখযুদ্ধের সময় দূরপাল্লার কামানের সাহায্যে আক্রমণে সাহায্য করেছে। আর শেষে যৌথভাবে মিত্রবাহিনী গঠন করে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রায় চার হাজার ভারতীয় সৈন্য শহীদ হয়েছেন। এভাবে ভারত প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সর্বাত্মক সহযোগিতা:

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাপের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে প্রায় এক কোটি শরণার্থী কেবল অর্থনৈতিক চাপ নয় স্থানীয় সমাজেও অনেক রকমের চাপ তৈরি করেছিল। যদিও শরণার্থীদের জন্যে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও উন্নত দেশ সহায়তা দিচ্ছিল তবু এর মূল চাপ নিতে হয় ভারতের সরকার ও জনগণকে। আদতে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা ছিল সর্বাত্মক। তাদের বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন শরণার্থী শিবির নির্মাণ, ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা দিয়েছে। তাদের জনগণ শরণার্থীদের জন্যে বাড়তি করও দিয়েছেন। আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে কলকাতার শিল্পী-সাহিত্যিকরা গঠন করেছিলেন 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। এর সভাপতি ছিলেন কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বভারতীয় অঙ্গনেও বহু মানুষ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে মানবতাবাদী নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন থেকে ২১ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের মিত্রদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন নারী সংগঠন, খেলোয়াড়দের সংগঠন ইত্যাদি সমাজে সব অংশই সেদিন আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে কাজে যুক্ত হয়েছিল। এ ধরনের নানা উদ্যোগ সারা বছরই চলেছে।

আঞ্চলিক রাজনীতির তখনকার হালচাল:

আমরা তো জানি যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই উপমহাদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় দেশ ভাগ করে দুটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান ও ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছিল। সেটা ছিল ১৯৪৭ সালের ঘটনা - পাকিস্তান সে বছর ১৪ আগস্ট ও ভারত ১৫ আগস্ট স্বাধীন হয়েছিল।

পাকিস্তান ছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের যে দাবি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ তুলে ধরেছিল তারই বাস্তব রূপায়ণ। ফলে এর শাসকরা চেয়েছিল পাকিস্তানকে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে। অপরদিকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার চেয়েছে দেশকে সব ধর্মের ও মতামতের মানুষের আবাসভূমি হিসেবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে। বলা যায়, স্বাধীনতার পর থেকেই দুটি দেশের আদর্শ ছিল ভিন্ন। তাছাড়া পাকিস্তান দীর্ঘকাল উপমহাদেশের অঙ্গ হিসেবে থাকার পরে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করতে গিয়ে হিন্দু ও ভারত বিরোধিতার রাজনীতি শুরু করেছিল। তোমরা শুনলে অবাক হবে, আমাদের ভাষা আন্দোলনকেও তারা হিন্দু ও ভারতীয় চরদের কারসাজি ও ষড়যন্ত্র বলে প্রচার চালিয়েছিল।

এর বাইরে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিবেশী হিসেবে এ অঞ্চলের রাজনীতিতে চীনেরও প্রভাব ছিল। একসময় চীন-ভারত খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু পরে দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে মতবিরোধ হয়। যা ১৯৬২ সালে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। এরপর থেকে এই দুই বড় দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তারা একপর্যায়ে ভারতের বদলে পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়।

এদিকে ভারত বিশ্বরাজনীতিতে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখতে চাইলেও পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গভীর সম্পর্কে জড়ায়। পাকিস্তান শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একাধিক সামরিক চুক্তি এবং বিভিন্ন সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল।

বিশ্বরাজনীতির তখনকার হালচাল:

সেই সময় বিশ্বের দুটি প্রধান শক্তিধর দেশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে। বলা যায়। ১৯৮০ পর্যন্ত এই দেশ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন বা দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তীকালে সেসব দেশের আত্মসামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তবে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয় এবং এটি ভেঙে ইউরোপ ও এশিয়ায় অনেক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মনে রেখো আমরা বলছি ১৯৭১ সনের কথা যখন এদেশটিও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাবশালী শক্তিধর দেশ।

তখন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে বলা হতো পরাশক্তি। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক ও বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী দেশগুলো ও এশিয়ার জাপান আর অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবা জোটবদ্ধ হয়েছিল। এভাবে দুটি শিবির বা মেরুতে যেন বিভক্ত হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো। চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও ষাটের দশকের গোড়াতেই তাদের আদর্শগত ও কৌশলগত বিরোধ তৈরি হয় তৈরি হয়সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। তাই তারা ছিল এই দুই মেরুভিত্তিক বিভাজন থেকে দূরে। তখন বাকি উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোকে বলা হতো তৃতীয় বিশ্ব।

এ পর্যায়ে আমাদের আরেকটু জানতে হবে সৌদি আরবসহ সেই অঞ্চলের মুসলমান প্রধান দেশগুলো সম্পর্কে। এ দেশগুলো প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর থেকে স্বাধীন হলেও অধিকাংশ দেশেই চলছিল রাজতন্ত্র বা একনায়কের শাসন। আদতে এই শাসকদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স। গোত্রভিত্তিক সমাজে তখন আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তা-ভাবনা তেমন প্রবেশ করেনি। শাসকরা প্রথম বিশ্বের তোষণ এবং ইসলামের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের নীতির সমন্বয় ঘটিয়েছিল। মুসলমান প্রধান এবং মার্কিন বলয়ের ঘনিষ্ঠ দেশ হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব ছিল এসব দেশের।

১৯৫০-এর দশকজুড়ে উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে একে একে মুক্ত হয়েছে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ আর সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন ও আদর্শ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সারা বিশ্বের তরুণ এবং সৃষ্টিশীল লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। ১৯৫৯ সালে কিউবায় ঘটে যায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব এবং এর দুই নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারা সারা বিশ্বের তরুণসমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলেন। বিশ্বরাজনীতির এই বাস্তবতার মধ্যে ষাটের দশকজুড়ে আমাদের দেশের মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে গেছে, যা ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণার মাধ্যমে এক দাবি স্বাধীনতায় এসে পৌঁছায়। এই প্রেক্ষাপট মনে রাখলে মুক্তি সনদ ছয় দফায় এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপট নিশ্চয় বোঝা কঠিন হবে না।

নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ:

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে আমাদের আরও একটি উদ্যোগের কথা জানতে হবে।

১৯৬১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ আহমদ সুকর্ণ, মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসের, ঘানার স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রেসিডেন্ট কোয়ামে এনক্রুমা এবং তৎকালীন যুগোশ্লোভিয়ার (বর্তমানে বহু দেশে বিভক্ত, যেমন বসনিয়া, সার্বিয়া, মেসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া ইত্যাদি) প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রজ টিটো প্রমুখ মিলে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ তৃতীয় পথ তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। সেটি তখন সফলও হয়েছিল। এটির নামকরণ হয়েছিল নন-অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট (NAM) বা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। এটি একটি জোট। ষাট ও সত্তরের দশকে বিশ্বরাজনীতিতে এই জোট ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সর্বশেষ ১২০টি দেশ এর সদস্য ছিল। এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো গণ্য হতো তৃতীয় বিশ্ব নামে। প্রথম বিশ্ব পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক উন্নত পশ্চিমা দেশগুলো, দ্বিতীয় বিশ্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। তবে এখন এভাবে আর বলা যায় না, কারণ বাস্তবতা পাল্টে গেছে।

ভারত ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় দেশ। আর পাকিস্তান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ের অন্তর্ভুক্ত দেশ। বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে দু'দেশের অবস্থানের পার্থক্য নিশ্চয় তোমাদের কাছেও পরিষ্কার।

বিশ্বরাজনীতির বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধ:

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের এই সমীকরণের প্রভাব পড়েছিল। দেখা গেল ভারত যখন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সহায়তা দেওয়ার জন্যে উদ্যোগী হয়েছে তখন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো দুই শক্তিধর

দেশের অবস্থান ছিল তার বিপক্ষে। তবে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মেনি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা জাপানের মতো যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী অনেক মিত্র দেশ ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানের অমানবিক নিষ্ঠুরতার কারণে বাংলাদেশ ইস্যুতে অনেকটা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল। আমাদের সরকারও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মিত্র বাড়ানোর তৎপরতা চালিয়ে গেছে। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সর্বাত্মক প্রয়াস ছিল অতুলনীয়। দেশের অভ্যন্তরে তিনি সব রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির ঐক্য গঠনে সফল হয়েছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের সব প্রভাবশালী দেশ সফর করে তাদের কাছ থেকে মানবিক সহায়তা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সমর্থন এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সহায়তা বন্ধে সম্মত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এছাড়া তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিচার বন্ধেও সমর্থন আদায়ে চেষ্টা চালিয়ে যান। বাংলাদেশে পাকিস্তানের নির্মম অমানবিক হত্যাযজ্ঞের চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে বাংলাদেশ সরকার ও তাঁর প্রয়াসের কারণে অনেক দেশই শরণার্থীদের জন্যে মানবিক সহায়তার কাজে অংশ নিয়েছে। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ ইস্যুতে বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী দেশই নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছে। এতে মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব শক্তির অবস্থান অনেকাংশেই বাংলাদেশের অনুকূলে ছিল। বাংলাদেশ সরকার বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরীকে সরকারের ভ্রাম্যমাণ দূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থন আদায়ে কাজ করার জন্যে।

তবে একথা মানতে হবে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের দামাল যোদ্ধারা অকুতোভয় ভূমিকা পালন করায় এবং সারা দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে থাকায় হানাদার বাহিনীর পক্ষে কিছুতেই সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের যোদ্ধারা জীবনপণ লড়াই করায় এ যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়েছে।

মিত্র দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন:

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের অনুকূলে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুবার তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। ভেটো ক্ষমতা কেবল পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য রাষ্ট্রের রয়েছে। এ ক্ষমতার ফলে তারা এককভাবে অন্যদের সম্মিলিত প্রস্তাবও ঠেকিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবকটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন। তোমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে বিশ্বের কোন ৫টি রাষ্ট্র এমন ক্ষমতাধর। সেই দেশগুলো হলো - চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

৯ আগস্ট ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাথে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে যেন প্রতিপক্ষকে জানান দিল যে পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করলে তারা চুপ থাকবে না, বন্ধুরাষ্ট্রের সহায়তায় এগিয়ে আসবে। এ সত্ত্বেও ডিসেম্বরে যখন পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায় ও দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় তখন সবার ধারণা হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্যে বঙ্গোপসাগরে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ সপ্তম নৌবহর পাঠাবে। আর চীন হিমালয়ের দিকে থেকে ভারতে আক্রমণ চালাবে। তবে সোভিয়েত হুঁশিয়ারি ও সহায়তা এবং ভারত-বাংলাদেশ মিত্রবাহিনীর তৎপরতায় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি বলে তারা কেউই পাকিস্তানের পক্ষে কোনো রকম সামরিক তৎপরতা চালাতে পারেনি। বরং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপর ৬ ডিসেম্বর একই দিন প্রথমে ভূটান ও তারপরে ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ বিজয়ের আগেই আমাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি আসতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্বসমাজ: সাংবাদিক

মুক্তিযুদ্ধের আরও একটি দিক আমাদের জানা জরুরি। বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজন থাকলেও সব দেশের জনগণের মধ্যে ছিল বিপুল সমর্থন ও গভীর সহানুভূতি। একেবারে শুরু থেকেই এমনটা ঘটার কারণ পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের আকস্মিকতা, নির্বিচার হত্যা এবং অপ্রস্তুত নিরীহ মানুষের ওপর বেপরোয়া আক্রমণ যে কোনো মানুষকে দু:খ দিয়েছে, ক্ষুব্ধ করেছে।

পঁচিশে মার্চের সেই কালরাতে অপারেশন সার্চলাইট শুরুর আগে পাকিস্তানের তখনকার প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদরা ঢাকায় অবস্থান করে নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা বৈঠক চালাচ্ছিল। বৈঠকের হালচাল ও অগ্রগতির খবর নেওয়ার জন্যে তখন দেশি-বিদেশি বহু সাংবাদিক ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। পাকিস্তান সরকারের উচ্চমহল সে রাতের অভিযানের কথা গোপন রেখে নিজেরা নীরবে সন্ধ্যার মধ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং সব বিদেশি সাংবাদিককেও দেশত্যাগে বাধ্য করেন। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে লুকিয়ে কীভাবে খবর সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা পরে দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত হলে সারা বিশ্বে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে তথ্য তোমরা আগেই জেনেছ।

তবে গণমাধ্যমে এর চেয়েও বড় চমক ঘটিয়েছে ও প্রভাব বিস্তার করেছে অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস নামে এক পাকিস্তানি সাংবাদিকের প্রতিবেদন। অপারেশন সার্চলাইটের নেতিবাচক ধারণা মুছতে পূর্ব পাকিস্তানে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক চলছে তা প্রমাণ করার জন্যে গভর্নর টিক্কা খান এক দল পাকিস্তানি সাংবাদিককে এপ্রিল মাসে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান। সফরের সময় খোদ সামরিক কর্মকর্তাদের মুখেই শোনা গেছে তাদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের কথা। তাছাড়া নানা জায়গা ঘুরে ম্যাসকারেনহাস আসল ঘটনা বুঝতে পেরেছিলেন। অন্যরা করাচি ফিরে পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী বানোয়াট খবর ছাপালেও ম্যাসকারেনহাস তা পারেননি। তাঁর বিবেক এমন কাজে সায় দেয়নি। তিনি প্রথমে অসুস্থতার কথা বলে খবর লেখা থেকে বিরত থাকেন। তারপর বোনের অসুখের কথা বলে তাঁকে দেখতে লন্ডন চলে যান এবং সেখানে লন্ডনের প্রভাবশালী পত্রিকা সানডে টাইমসের সম্পাদক হ্যাঁরল্ড ইভান্সের সাথে দেখা করে সব কথা খুলে বলেন। এ ভদ্রলোক আগেই এ ঘটনার কথা শুনেছিলেন বলে ম্যাসকারেনহাসকে আস্থায় নেন। খবরটি ছাপানো হলে তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিপদ হবে বলে তিনি একটু সময় নেন। দেশে ফিরে ম্যাসকারেনহাস পরিবারকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তখন পাকিস্তানের নাগরিকদের বছরে একবারের বেশি বিদেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তিনি পেশোয়ারে এসে পায়ে হেঁটে দুর্গম সীমান্ত পার হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছান। তারপর সেখান থেকে প্লেনে আসেন লন্ডনে। এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর ৯ হাজার শব্দের বিস্ফোরক খবর। শিরোনাম ছিল এক শব্দে–‘গণহত্যা’। সম্পাদক ইভান্স লেখেন ছোট্ট নিবন্ধ - ‘হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করো’। ম্যাসকারেনহাসের এই প্রতিবেদন বিশ্বের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ এবং জনগণকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এটি যেন মুক্তিযুদ্ধের গতিপথ ঠিক করে দেয়।

দেখা গেল এভাবে আরও কয়েকজন সাংবাদিক ভেতরের খবর বাইরে পাঠাতে সক্ষম হন। দেশের ভেতর থেকে বাংলাদেশি সাংবাদিকরাও বিদেশে খবর পাঠিয়ে গেছেন পুরো নয় মাস। এঁদের মধ্যে শহীদ নিজামুদ্দীন আহমেদ ও সৈয়দ নাজমুল হক বিদেশি গণমাধ্যমে কাজ করতেন। তাঁরা দু’জন এবং আরও অনেকেই ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হিসেবে আলবদরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। তবে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের পাঠানো ছবি ও খবর বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছিল। ফলে প্রথম থেকেই সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষের সমর্থন আমাদের পক্ষেই তৈরি হতে থাকে।

গণমাধ্যম ও জনপ্রতিনিধি:

পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণের পরে বাংলাদেশের যেসব সাংবাদিক, শিল্পী-সাহিত্যিক আগরতলা বা কলকাতায় পৌঁছান তাঁরাও ভারত ও অন্যান্য দেশের সাংবাদিকদের কাছে দেশের ভেতরের প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করেন। ফলে প্রথম থেকেই ভারতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং শরণার্থীদের খবর প্রচার করে এসেছে। ইংল্যান্ডের বেসরকারী বেতার কেন্দ্র বিবিসি, মার্কিন বেতার কেন্দ্র ভোয়া, ভারতের আকাশবানীসহ বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। পাশাপাশি নয় মাসজুড়েই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের নানা সাফল্যের খবরও পরিবেশন করেছে। এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে শরণার্থী শিবিরে লাখ লাখ মানুষের কষ্টকর জীবন, অসহায় মৃত্যু, খাদ্যাভাবে অপুষ্টির শিকার শিশুদের অসহায় দুর্ভোগের বিবরণী ও ছবি প্রভৃতি।

দেখা গেল খোদ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জনপ্রতিনিধিরাও দলে দলে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে আসছেন এবং বাংলাদেশের মানুষের দু:খ-কষ্টের সমব্যথী হচ্ছেন ও অনেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, স্যাক্সবি, গ্যালাঘ এবং ব্রিটিশ এমপি জন স্টোনহাউজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এদিকে ফ্রান্সের সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী, বিশিষ্ট লেখক আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোর বন্দর ঘেরাও করেন সাধারণ মার্কিন নাগরিকরা। তাঁরা পাকিস্তানের জন্যে জাহাজে অস্ত্র বোঝাই করতে দেবেন না। তাঁদের বাধা সেদিন উপেক্ষা করা যায়নি।

বিশ্বের খ্যাতিমান সব পত্রিকা ও সাময়িকীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে খবর, ফিচার ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত সাময়িকী টাইম ও নিউজউইকে একাধিকবার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রচ্ছদ কাহিনী হয়েছিল, একবার প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। সেই সময় কিছু সাংবাদিকের নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরেছিল যেমন– সাইমন ড্রিং, ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ, পিটার হেজেলহার্স্ট, সিডনি শ্যানবার্গ, অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, জুলিয়ান ফ্রান্সিস, মার্ক টালি,উইলিয়াম ক্রলি, ভারতীয় আলোকচিত্রি রঘু রাই, কিশোর পারেখ প্রমুখ। প্রথম সারির ব্রিটিশ পত্রপত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফ, গার্ডিয়ান, ইকনোমিস্ট, স্টেটসম্যান, দি টাইমস, ফিন্যাসশিয়াল টাইমস প্রভৃতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো পত্রিকাসহ সারা বিশ্বের অধিকাংশ পত্রিকার ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের অনুকূলে। বিশ্বজনমত তৈরিতে এটি বড় ভূমিকা রেখেছিল।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবদান:

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ভূমিকা গ্রহণে শিল্পী-সাহিত্যিকরাও পিছিয়ে থাকেন নি। বিখ্যাত ভারতীয় সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশংকর ও ব্রিটিশ গায়ক বিটলস্খ্যাত জর্জ হ্যাঁরিসন মিলে বাংলাদেশ যুদ্ধে সহায়তার জন্যে ১৯৭১-এর আগস্টের ১ তারিখ নিউ ইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আয়োজন করেছিল কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। তাতে হ্যাঁরিসন এবং আরেকজন খ্যাতিমান মার্কিন গায়িকা জোয়ান বায়েজ বাংলাদেশ নিয়ে আবেগপূর্ণ গান গেয়ে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন। পণ্ডিত রবিশংকর, উস্তাদ আলী আকবর খান ও পণ্ডিত আল্লা রাখার সেদিনের বাদন মানুষ আজও স্মরণ করে। পঞ্চাশ হাজার মানুষ এই কনসার্ট সরাসরি উপভোগ করেছিল। এদিকে ভারতজুড়ে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজবীরা নানা আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার সপক্ষে

সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক মানবিক উদ্যোগও গঠিত হয়েছিল অনেকগুলো। শরণার্থী শিবিরে অসংখ্য শিশুর চরম ভোগান্তি ও মৃত্যু উন্নত বিশ্বের শিশুদেরও টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বাংলাদেশের জন্যে সহায়তা তহবিলে দানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অক্সফাম, সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউনিসেফসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা শরণার্থীদের সহায়তায় নিরলস কাজ করে গেছে। তখন বাংলাদেশের পক্ষে অনেক বেসরকারী সংস্থাও গড়ে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত হয়েছিল ফ্রেন্ডস্ অব বাংলাদেশ, আমেরিকান ফর ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন, বাংলাদেশ ডিফেন্স লিগসহ অনেক প্রতিষ্ঠান। ইংল্যান্ডের অপারেশন ওমেগা, অ্যাকশন বাংলাদেশ, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস্ প্রভৃতি বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছে।

ষাটজনের সাক্ষ্য:

বিশ্বের বিখ্যাত ষাটজন মনীষী প্রকাশ করেছিলেন টেস্টিমনি অব সিক্সটি - ষাটজনের সাক্ষ্য। এ হলো এমন ষাটজন খ্যাতিমান মানুষের বক্তব্য যাঁরা তখন পূর্ব পাকিস্তানে যে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাদার তেরেসা, মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, বিখ্যাত সাংবাদিক ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ, জন পিলজার প্রমুখ। মাদার তেরেসা সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছেন - 'আমি পাঁচ-ছয় মাস ধরে শরণার্থীদের মধ্যে কাজ করছি। আমি এসব শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মরতে দেখেছি। সে কারণেই আমি পৃথিবীকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই পরিস্থিতিটা কত ভয়াবহ এবং কত জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য দরকার। '

আর মার্কিন গায়িকা জোয়ান বায়েজের কণ্ঠে নিউ ইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ধ্বনিত হয়েছিল তাঁরই রচিত গানের কলি -

বাংলাদেশ বাংলাদেশ

যখন সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়

তখন বাংলাদেশের দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একদিকে বহু বিয়োগান্তক ঘটনা, অসংখ্য নিষ্ঠুরতা, ধ্বংস, হত্যা, রোগ, অপুষ্টি, মৃত্যু আর অন্যদিকে মৈত্রী, সেবা, সহানুভূতি, মানবতা, যুদ্ধ, বীরত্ব, ত্যাগ, বিজয় এবং বিজয়ের উল্লাস।

তবে বিশ্বমানবতা সেদিন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং তাই শেষ পর্যন্ত সব বাধা পেরিয়ে আমরা অর্জন করতে পেরেছি স্বাধীনতা । আমাদের শ্যামল জমিনে রক্তলাল রঙে সূর্য উদিত হয়েছিল অমানিশার অন্ধকার কাটিয়ে।

অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ:

নন্দিনীর বাবার কাছ থেকে সব কিছু শুনে ওরা সাবাই যেন হঠাৎ করে অনেক বড় হয়ে উঠল। মুক্তিযুদ্ধের এদিকটি তারা আগে কখনও খেয়াল করেনি।

অন্বেষা মুগ্ধতা নিয়ে বলল, সত্যিই তো কত দেশ কত মানুষ কত কত প্রতিষ্ঠান আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন!

আদনান বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, এ নিয়ে আমাদের খুব ভালো কাজ করতে হবে। সবাই কিন্তু এ ব্যাপারে সিরিয়াস থাকব আমরা।

খুশি আপা ওদের মনোভাব দেখে খুশি মনে বললেন, তোমরা তো আগেই অনুসন্ধানের বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনেছ, এবার প্রত্যেকটি বিষয়ে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে তা ঠিক করে ফেল।

ওরা আলোচনা করে অনুসন্ধনের প্রশ্ন ঠিক করল।

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিপুল শরণার্থী কোথায় এবং কীভাবে আশ্রয় পেয়েছিল?

২. অপারেশন সার্চলাইটের নৃশংস হত্যাকান্ডের খবর বিশ্বে কীভাবে ছড়িয়েছিল?

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে কারা সাহায্য করেছিল?

এভাবে আমরা আরও প্রশ্ন তৈরি করব। প্রত্যেক দল নিজ নিজ বিষয়ভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্নের তালিকা, তথ্য প্রাপ্তির উৎসের তালিকা এবং প্রাপ্ত তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি লিখব।

এরপর ক্লাসের সব বন্ধুদের প্রতিটি দলের প্রত্যেকে প্রথমে নিজ পরিবার এবং পরে এলাকার অন্যান্য বয়স্ক মানুষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করল। দলের সব সদস্য তাদের প্রাপ্ত তথ্য একত্র করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করল। প্রতিটি দল খুশি আপার সাথে তাদের প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করল।

– খুশি আপা দলগুলোর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে কি না তার খোঁজ-খবর রাখলেন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিলেন। কিন্তু কোন মতামত চাপিয়ে না দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন এবং প্রয়োজনে কারিগরি (যেমন- তথ্য সংগ্রহের জন্য রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি) ও প্রশাসনিক (যেমন- কোনো জায়গায় প্রবেশ করতে বিশেষ অনুমতি দরকার হলে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শক্রমে চিঠি দেওয়া) সহায়তা দিলেন।

– দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদিকদের ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকা, শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় মূল ভার বহনকারী দেশ ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভূমিকা, প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং বিজয় অর্জন পর্যন্ত তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব ও এতে দেশটির অবদান, জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার ভূমিকা, সোভিয়ত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্র দেশের ভূমিকা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্যোগ সম্পর্কে বর্ষীয়ান বা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করল। এ বিষয়গুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করল এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দলের সদস্যরা নোট করে নিল।

– খুশি আপা সতর্কতার সাথে দলের প্রত্যেক সদস্যই পর্যায়ক্রমে যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, অবদান রাখতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করলেন।

তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ

– -খুশি আপা বারবার দলগুলোর কাছ থেকে তথ্যের সঠিকতা যাচাই কীভাবে করবে তার ধারণা নিলেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। তবে দলগুলোর ওপর কোনো মতামত চাপিয়ে দিলেন না।

– -সবাই দলগতভাবে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জন করে তা বিশ্লেষণ করল এবং নিজেদের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই কাজের অভিজ্ঞতাসমূহ শ্রেণিকক্ষে খুশি আপা ও অন্যান্য দলের সামনে উপস্থাপন করল।

ফলাফল তৈরি ও উপস্থাপন

- এই পর্যায়ে খুশি আপা জানতে চাইলেন, এই কাজের মধ্য দিয়ে তোমরা মুক্তিযুদ্ধের যেসব ঘটনা খুঁজে এনেছ সেগুলো কীভাবে তোমরা অন্যদের জানাতে পারো?
- সবাই দলে আলোচনা করে বিভিন্ন সৃজনশীল ও অভিনব উপায় পরিকল্পনা করল। যেমন- ফটোবুক, ডকুমেন্টারি, দেওয়ালিকা, পোস্টার, লিফলেট, ফটোগ্রাফি বা আঁকা ছবি প্রদর্শনী, বই, নাটক ইত্যাদি। খুশি আপা এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তাদের পরিকল্পনা করতে দিলেন, শুধু সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও ইস্যুসমূহ সম্পর্কে সচেতন করলেন। খুশি আপার পরামর্শ নিয়ে দলগুলো তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করল এবং কোনো জাতীয় দিবসে তা অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করল।
- এবার খুশি আপা বললেন, বিদ্যালয়ে উদযাপিত যেকোনো জাতীয় দিবস যেমন- ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস , ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্রভৃতি জাতীয় দিবসের সাথে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের সামনেও তোমাদের প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করতে পারো। আমরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব।
- এছাড়াও তোমরা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বইয়ের প্রদর্শনী, বছরব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই পাঠ প্রতিযোগিতা, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী (যেমন স্টপ জেনোসাইড, লিবারেশন ওয়ার, নাইন মান্থস্ টু ফ্রিডম প্রভৃতি), মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রাঙ্কন ও প্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক মঞ্চায়ন, মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি বহুবিধ আয়োজনের মাধ্যমে তোমাদের আগ্রহ, উপলব্ধি ও দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারবে।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক অনুসারে বন্ধুরা তাদের প্রকল্পটি উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিবাবক, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি/মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত থাকলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ

এরপর খুশি আপা মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করেছিল এসব বিদেশি বন্ধুদের স্মৃতি ধরে রাখার স্থায়ী কোনো উপায় করা যায় কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। বললেন যে, প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিফলন হিসেবে তোমরা নিজ নিজ এলাকায় "শিক্ষার্থী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী বিদেশি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ" করতে পারো বা পুনর্নির্মাণের নকশা তৈরির পরিকল্পনা বা প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে পারো/ তাদের নামে কোনো রাস্তা বা বিশেষ জায়গা করা যায় কি না তা ভাবতে পারো এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের (উপজেলা বা জেলা) সহযোগিতার আবেদন করতে পারো।

ডকুমেন্টেশন

সবশেষে দলগুলো দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ, আত্ম-প্রতিফলনের লিখিত রূপ এবং অর্জিত শিখনের সারসংক্ষেপ (ছবি/ভিডিও/লিখিত রূপ/খসড়া এর হার্ড বা সফট কপি) খুশি আপার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করল।

সামাজিক মূল্যবোধ ও রীতি নীতি

নীলা ক্লাসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর বন্ধুরা ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু নীলার কান্না কিছুতেই থামছে না। এমন সময় খুশি আপা এলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কী হয়েছে নীলা, কাঁদছ কেন?

তাতে নীলার কান্নার বেগ আর একটু বাড়ল কেবল। নীলার বন্ধুরা খুশি আপাকে যা জানাল তাঁর মানে হলো, নীলার বোন নীলার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন। কয়েক দিন আগে নীলার সেই বোনের বিয়ে হয়েছে, বোন শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে। আজ কথা প্রসঙ্গে ফ্রান্সিস নীলার বোনের কথা জিজ্ঞেস করতেই হঠাৎ করেই নীলা কাঁদতে শুরু করে।

খুশি আপা নীলাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কষ্ট! তোমার দু:খে আমাদের সবারই অনেক মন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু এমন কষ্ট শুধু তোমার একার নয়, আমাদের সমাজে প্রায় সবারই এ রকম কষ্টের অভিজ্ঞতা আছে।

নীলা একটু শান্ত হলে খুশি আপা বললেন, চলো আমরা দলগতভাবে একটা লেখা থেকে কিছু অংশ পড়ি। আজ থেকে প্রায় ১৩০ বছরেরও বেশি আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি লিখেছিলেন। এতক্ষণে নীলা কান্না থামিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

.....বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। ছেলেদের মতো চুল ছাটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান, সপ্রিতভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। ...ছেলেদের মতো আত্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারি নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। .. অবশেষে যখন যাত্রার সময় হলো তখন দেখলুম আমার সেই চুল-ছাঁটা, গোলগাল-হাতে-বালা-পরা, উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকায় তুললে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে-নৌকা যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ

মুছতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চ'ড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নি:শব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুল খেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে সে একে টিপিয়েও দিত। সকাল বেলার সকাল বেলার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদের পূর্ণ বোধ হতে লাগল!.. মনে হমল, সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ। ... বিদায়কালে এই নৌকা করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে সেন আরও একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা সেন মৃত্যুর মতো তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া-যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ...

পড়া শেষে হলে মিলি বলল, এটাতো নীলার বড় বোনের শ্বশুড়বাড়ি চলে যাবার মতো একই রকম ঘটনা মনে হচ্ছে! গল্পের ছোট মেয়েটাও নীলার মতো ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। সাবা বলল, আরো কয়েকজন মেয়েও কাঁদছে। রফিক অবাক হয়ে বলল, আচ্ছা, সবাই যখন এত কষ্টই পাচ্ছে, তখন মেয়েটাকে শ্বশুড়বাড়িতে পাঠাচ্ছে কেন! নীলা বলল, আমার বোনের বিয়ের পরে আমিও এই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সবাই বলেছে, এটাই নিয়ম। বিয়ের পর মেয়েরা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুড় বাড়ি চলে যায়। ওমেরা বলল, সব মেয়েদের তো শ্বশুরবাড়িতে যেতে হয় না! গারো সম্প্রদায়ে, বেদে সম্প্রদায়ে বিয়ের পরে ছেলেরাই মেয়েদের বাড়িতে চলে আসে। বুশরা জিজ্ঞাসা করল, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে এমন ভিন্ন রকম ব্যবস্থা কেন? খুশি আপা বললেন, দারুণ! আলোচনা জমে উঠেছে। তোমরা অসাধারণ কিছু প্রশ্ন তুলেছ! আচ্ছা এসব প্রশ্নে উত্তর খোঁজার আগে চলো আমরা আরেকটা মজার ছবি দেখে নিই।

মিষ্টি খাওয়াও!

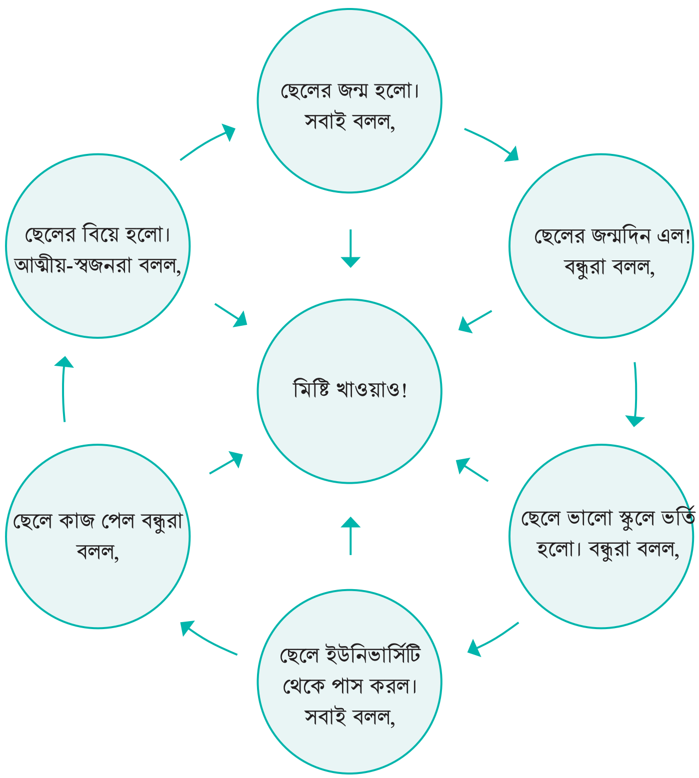

খুশি আপা বললেন, এই ছবির মতো ঘটনা কি তোমরা কখনও দেখেছ? ফাতেমা বলল, আমার পাশের বাড়িতে একটা বাচ্চা জন্মেছিল। ওদের বাড়ি থেকে পাড়ার সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছিল। গণেশ বলল, আমার বড় বোনের পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার পর বাবা-মা সবাইকে মিষ্টি দিয়েছিল। আয়েশা বলল, আমার ছোট মামা চাকরি পাওয়ার পর আমাদের বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন। খুশি আপা বললেন, এই ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা কিন্তু সবগুলো ঘটনার মধ্যে একটা মিল আছে। অন্বেষা বলল, হ্যাঁ আপা, সবগুলোই আনন্দের খবর। খুশি আপা বললেন, ভালো কিছু হলে অন্যদের 'মিষ্টিমুখ করানো' আমাদের সমাজের একটা নিয়ম। এবার চলো একটা মজার কাজ করি।

খুশি আপা ওদের নিচের ছবিগুলো দেখিয়ে জানতে চাইলেন, ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

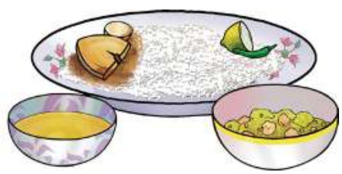

ওরা ছবি দেখে বর্ণনা দিল, কারো সাথে দেখা হলে সালাম বিনিময় করা, বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা, মালা বদল, পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খাওয়া, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য উঠে দাঁড়ানো, তাঁদের বসার জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া, কারোর সঙ্গে দেখা হলে হাসিমুখে কথা বলা, বাসায় অতিথি এলে আপ্যায়ন করা।

খুশি আপা: এগুলোও আমাদের সমাজে প্রচলিত নানান নিয়ম। এ রকম আর কোনো নিয়মের কথা কি তোমাদের মনে পড়ছে?

অন্বেষা: একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া।

মোজাম্মেল: বেদে সম্প্রদায়ে বিয়ের সময় ছেলেদের গাছের উঁচু ডালে উঠে বসে থাকা।

আনাই: সাংগ্রাইয়ের সময় মারমাদের 'পানি খেলা'।

ফ্রান্সিস: প্রথম পড়া দাঁত বালিশের তলায় রেখে দেওয়া।

সালমা: জন্মদিনে কেক কাটা।

মাহবুব: টয়লেট ব্যবহার করার পর আরো বেশি পরিষ্কার করে রাখা।

হাচ্চা: সবার সামনে বায়ু ত্যাগ না করা।

হাচ্চার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল! খুশি আপাও হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর বললেন, বাহ্, আমরা তো দেশ-বিদেশের অনেক সামাজিক নিয়মের কথাই জানি! এবার চলো, এগুলো নিয়ে একটা মজার কাজ করি। প্রত্যেকে নিচের ছকটা ব্যবহার করে আমাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে কথা

বলে তারা কোন কোন সামাজিক নিয়ম মেনে চলে তার একটি তালিকা তৈরি করি। এসব নিয়ম-কানুন তারা কোথা থেকে জানতে পেরেছেন? নিয়ম না মানলে কী হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তরও জেনে নিই। ছকটিতে উদাহরণ হিসেবে একটি সামাজিক নিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যতগুলো খুঁজে পাবে সবগুলো এই তালিকায় যোগ করব আর প্রশ্ন করে উত্তরও জেনে নেব। আমরা আরও বেশি ঘর এঁকে যতগুলো সম্ভব সামাজিক নিয়ম এই তালিকায় যুক্ত করব।

ক্রম	সামাজিক নিয়মের তালিকা	নিয়ম পালনের কথা কে বলে দিয়েছে?/কোথা থেকে জেনেছেন?	এই নিয়ম পালন না করলে কী হতে পারে?
১।	বড়দের শ্রদ্ধা করা	বাবা-মা, বয়স্ক আত্মীয়-স্বজন	সবাই অপছন্দ করবে। অভদ্র বলবে।
২।	....		
৩।	....		
৪।	....		

কয়েক দিন পর শ্রেণিকক্ষে সবাই অনেকগুলো সামাজিক নিয়মের তালিকা নিয়ে হাজির হলো। খুশি আপা বললেন, অসাধারণ কাজ করেছ তোমরা! সবার উপস্থাপন শেষে বোঝা গেল:

- অধিকাংশ মানুষ সামাজিক নিয়ম-কানুনগুলো জেনেছে তাদের পরিবার, পাড়া-পড়শি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে।
- সবাই জানে, এসব নিয়ম-কানুন মেনে না চললে আইন কোনো শাস্তি দেয় না। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ মানুষ এসব নিয়ম-না-মানা মানুষদের অপছন্দ করে।

এবারে ওপরের ছকটি ব্যবহার করে চলো আমরাও কাজটি করি। নিজেরা দেখে নিই, যাদের কাছে জিজ্ঞেস করে তালিকাটি তৈরি করছি,

- তারা নিজেরা এসব নিয়ম-কানুনের বিষয়ে কী মনে করেন?
- তারা কোথা থেকে নিয়মগুলো পেয়েছেন?
- এসব নিয়ম না মানলে কী হয়?

খুশি আপা এবার বললেন,

সমাজের এই অলিখিত নিয়ম-কানুনগুলোকে সামাজিক রীতি-নীতি বা সংস্কার বলে। সামাজিক রীতি-নীতি আমাদের বলে দেয় কোন পরিস্থিতিতে, কোন পরিবেশে, কার সাথে একজন মানুষকে কী ধরনের আচরণ করতে হবে। এগুলো মেনে চলবার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু কেউ না মানলে সমাজের মানুষ তাকে অপছন্দ করতে পারে।

শিহান বলল, কিন্তু আমরা যে দেখলাম আমাদের বন্ধু নীলা ও তার পরিবার, এমনকি রবীন্দ্রনাথের গল্পের

মানুষগুলোও রীতি-নীতি মেনে চলতে গিয়ে অনেক কষ্ট পেল! সাবা বলল, আবার এটাও তো দেখলাম, অনেক রীতি-নীতি আমাদের আনন্দ দিচ্ছে, অনেক উপকারেও লাগছে। যেমন-বড়দের শ্রদ্ধা করা, বসার জায়গা দেওয়া, টয়লেট ব্যবহারের পর ভালোভাবে পরিষ্কার করে বের হওয়া ইত্যাদি।

খুশি আপা বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছ। সমাজে প্রচলিত কিছু রীতি-নীতি অনুসরণ করা অনেক সময় কষ্টকর আবার অনেক রীতি-নীতি আমাদের জন্য উপকারী। চলো, এবার তাহলে আমরা এতক্ষণ যে কাজগুলো করেছি তা বিশ্লেষণ করি। ভাবনা-চিন্তা করে দেখি, আমাদের সামাজিক রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো কী? সবার আলোচনা থেকে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেল।

সামাজিক রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্য

১. সামাজিকভাবে তৈরি হয়।
২. সামাজিক রীতি-নীতি সমাজের একটি অপরিহার্য অংশ।
৩. সামাজিক রীতি-নীতি ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে।
৪. একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়/দেশে আলাদা রকমের সামাজিক রীতি-নীতি হতে পারে।
৫. রীতি-নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু অলিখিত নিয়ম-কানুন।
৬. সমাজের অধিকাংশ মানুষ চেষ্টা করে সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলতে।
৭. সমাজে নির্দেশমূলক ও নিষেধমূলক এই দুই ধরনের রীতি-নীতি দেখা যায়। নির্দেশমূলক রীতি-নীতি মানুষকে কোনো কাজ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়। আর নিষেধমূলক রীতি-নীতি কোনো কেনো বিশেষ কাজ করেতে নিষেধ করে থাকে।

বুশরা বলল, রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্য তো বুঝলাম। কিন্তু এগুলো আসলে সমাজে কী কাজ করে সেটা ভালো করে বুঝতে পারছি না। খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে আলোচনা করে বুঝে নিই সমাজে সামাজিক রীতি-নীতির ভূমিকা কী।

সমাজে সামাজিক রীতি-নীতির ভূমিকা

১. সমাজে মানুষের আচার ব্যবহার কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়।
২. সমাজের যাতে সবকিছু ঠিকমতো কাজ করে তা নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করে।
৩. মানুষের সমাজ গড়ে তোলার যে মূল উদ্দেশ্য—সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা, তা অর্জনে ভূমিকা রাখে।
৪. সবাই যদি সামাজিক রীতি-নীতি মেনে একই রকম আচার-ব্যবহার চর্চা করে, তাহলে সমাজের প্রতিদিন যে কাজগুলো হয় তা সুষ্ঠুভাবে হতে পারে।
৫. সমাজের মানুষের প্রতিদিনের কাজকর্ম যাতে কমবেশি একই রকম রুটিন অনুযায়ী চলে সে জন্য একটি সাধারণ মান ঠিক করে দেয়।
৬. সামাজিক মূল্যবোধ চর্চার সুযোগ তৈরি করে।
৭. সামাজিক বিচারে সফলতার মানদণ্ড তৈরি করে মানুষের মাঝে সফলতার অনুভূতি তৈরি করতে সহায়তা করে।

গৌতম বলল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, সমাজে সবাই একই ধরনের রীতি-নীতি বা নিয়ম-কানুন মেনে চলে কেন?

খুশি আপা বললেন, খুবই ভালো প্রশ্ন করেছ। তোমরা যখন এমন সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করো তখন আমার খুব আনন্দ হয়! তারপর রহস্যময়ভাবে একটুখানি হেসে বললেন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর আমরা আজ খুঁজব না। আগামীকাল আমরা এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কাজ করব।

পরদিন খুশি আপা বেশ উৎফুল্ল মনে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন স্বয়ং প্রধান শিক্ষক এসেছেন। তিনি সবাইকে কিছু একটা বোঝাচ্ছেন। সবার মুখ থমথমে। খুশি আপা ঢুকতেই অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেও সালমা, রূপা, মামুন, রনি, আদনান, শিহান, অন্বেষা, সুমন, আনাই, গণেশ, সালমা আর ফাতেমা দাঁড়ালো না এমনকি সালাম/নমস্কার/সম্ভাষণ কিছুই জানালো না । উল্টো মুখে দুষ্টুমি ভরা মুচকি হাসি নিয়ে নির্বিকারে বসে থাকলো। প্রধান শিক্ষক মহোদয় তীব্র হতাশা নিয়ে ওদের উদ্দেশ্যে বললেন, আবারও তোমরা একই কাজ করলে!! শিক্ষককে অসম্মান করলে! এতক্ষণ ধরে তোমাদের যে এত কিছু বললাম তার কিছুই তোমরা বুঝলে না! বিরক্তি নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর খুশি আপাকে বললেন, আপনার আগে গণিত, বাংলা আর বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসেছেন। সবাই তাদের সম্মান জানালেও, ঐ যে সামনের দিকে বসা এই কয়জন খুবই অদ্ভুত এবং অসঙ্গত আচরণ করছে আজ। খুশি আপা বিস্তারিত জানতে চাওয়ায় প্রধান শিক্ষক মহোদয় যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে— সালমা আর রূপা স্কুলের রীতি-নীতি উপেক্ষা করে কড়া লাল রংয়ের লিপিস্টিক দিয়ে এসেছে। মামুন আর অন্বেষা শিক্ষকসহ যারা তাদের কাছে কিছু চাইছে, তারা বাম হাত দিয়ে তা দিয়েছে। বারবার বোঝানোর পরও একই কাজ করছে। জামাল- স্কুলে এসেছে পিঠের দিকে শার্টের বোতাম লাগিয়ে। আর শিহান, রনি, সুমন, আনাই মগিনি, আদনান, সাবা— শিক্ষকদের সালাম/নমস্কার/সম্ভাষণ করেনি, উঠে দাঁড়িয়ে সম্মানও দেখায়নি। শিক্ষকরা খুবই কষ্ট পেয়েছেন ওদের এ ধরনের আচরণে।

খুশি আপা এবার প্রধান শিক্ষক মহোদয়কে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। ওরা সবাই খুব ভালো। যা কিছু করেছে, তা আমার পরামর্শে করেছে। সামাজিক রীতি-নীতি কেন মানুষ মেনে চলে, সেটা হাতে কলমে বোঝার জন্য গতকাল আমি সবার সাথে ওদের এই আচরণগুলো করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। আপনাদের স্বত:স্ফূর্ততা যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য আপনাদেরও বলিনি। সবার সাময়িক অসুবিধার জন্য আমার ও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আমি দু:খ প্রকাশ করছি। তখন শিক্ষার্থীরাও উঠে দাঁড়িয়ে প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের কাছে দু:খ প্রকাশ করল। প্রধান শিক্ষক মহোদয়ও হেসে সবাইকে শুভ কামনা জানিয়ে চলে গেলেন।

তখন খুশি আপা হাসিমুখে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, চলো, এবার আমরা একটু বিশ্লেষণ করে দেখি, আমাদের এই অভিজ্ঞতা থেকে কী পেলাম। তারপর যারা এই কাজে ভূমিকা রেখেছে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে বললেন। সবার আলোচনা থেকে যা বের হয়ে এলো, সেটাকে তারা নিচের সারণি ব্যবহার করে উপস্থাপন করল।

শিক্ষার্থীর নাম	আচরণের বর্ণনা	প্রতিক্রিয়ার বিবরণ
সালমা, রূপা	স্কুলের রীতিনীতি উপেক্ষা করে কড়া লাল রংয়ের লিপিস্টিক দিয়ে এসেছে	পরিবার- বাবা, মা, বড় ভাই-বোন, দাদী খুবই রাগ করেছেন প্রতিবেশী- ঘর থেকে বের হতেই পাশের বাড়ির চাচির সাথে দেখা। তিনি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছেন, স্কুলে যাচ্ছো না পিকনিকে! রাস্তায়- লোকজন অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছে। স্কুলে- দারোয়ান ঢুকতে দিতে চায়নি। সহপাঠীরা- হাসাহাসি করেছে। ব্যঙ্গ করেছে। শিক্ষকগণ- আহত হয়েছেন। হতাশ হয়েছেন। কষ্ট পেয়েছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।
মামুন, অন্বেষা	শিক্ষকসহ অন্য যে কেউই যতবারই তাদের কাছে কিছু চেয়েছে তারা বাম হাত দিয়ে তা দিয়েছে	পরিবার- বাবা, মা, বড় ভাই-বোন, দাদী বকা দিয়ে ডান হাতে দিতে বাধ্য করেছেন প্রতিবেশী- বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন যে ডান হাতে কী হয়েছে? সহপাঠীরা- নিষেধ করেছে যেন শিক্ষককে বাম হাতে না দেয়া হয়। তাহলে শিক্ষক রেগে যেতে পারেন। শিক্ষকগণ- আহত হয়েছেন। হতাশ হয়েছেন। কষ্ট পেয়েছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।
জামাল	স্কুলে এসেছে পিঠের দিকে শার্টের বোতাম লাগিয়ে	পরিবার- বাবা, মা, বড় ভাই-বোন, দাদী প্রথমে হাসাহাসি করেছেন। তারপর রাগ করেছেন। প্রতিবেশী- বাজারে নতুন ফ্যাশন এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে। রাস্তায়- লোকজন অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছে। হাসাহাসি করেছে। স্কুলে- দারোয়ান ঢুকতে দিতে চায়নি। বলেছে শার্ট ঠিক করে পরে ঢুকতে হবে। সহপাঠীরা- হাসাহাসি করেছে। ব্যঙ্গ করেছে। শিক্ষকগণ- আহত হয়েছেন। হতাশ হয়েছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

শিহান, রনি, সুমন, আনাই মগিনী, গণেশ, সাবা	শিক্ষকদের সালাম/ নমস্কার/সম্ভাষণ করেনি, উঠে দাড়িয়ে সম্মানও দেখায়নি	শিক্ষকগণ- অভদ্র ভেবেছেন। আহত হয়েছেন। হতাশ হয়েছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

যারা কাজটিতে অংশগ্রহণ করেছে খুশি আপা কৌতুকভরে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী? তোমাদের কেমন লেগেছে?

সালমা বলল, খুব খারাপ লেগেছে। সবার কথা আর আচরণে মনে হয়েছে আমি খুব খারাপ মেয়ে।

আনাই মগিনি বলল, ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। সবাই আমাদের খুবই অভদ্র ভেবেছে। মামুন আর অন্বেষাও একই মতো জানাল। জামাল বলল, সবাই আমাকে হাস্যকর ভেবেছে, খেপানোর চেষ্টা করেছে। মনে হচ্ছিল, কোথাও পালিয়ে যাই। শুধু ভাবছিলাম, কখন শার্টটা সোজা করে পরতে পারব।

রনি বলল, কিন্তু আমরা কেউই হাস্যকর বা বেয়াদব হিসেবে পরিচিত হতে চাই না। আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছি কেন মানুষ সামাজিক রীতি-নীতি পালন করে!

সালমা-শিহানদের অভিজ্ঞতাও আলোচনা করে সারণিটি পূরণ করার পর খুশি আপা বাকিদের উদ্দেশ্যে বললেন, এবার তোমরাও কোনো একটা রীতি-নীতি বাছাই করে, পরীক্ষামূলকভাবে দুই এক দিনের জন্য অনুসরণ করে, ওপরের সারণিটা পূরণ করে নিয়ে এসো। তবে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, অবশ্যই যাতে বাবা বা মা যে কোনো একজনকে ভালোভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে জানিয়ে রাখে। যাতে কোনো সমস্যা হলে তিনি অন্যদের বুঝিয়ে বলতে পারেন।

কয়েক দিন পর সবাই কাজটি শেষ করে ক্লাসে এসে দলগতভাবে তাদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করল। বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেন মানুষ সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলে তার কিছু কারণ তারা খুঁজে বের করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করল। সবার উপস্থাপনা থেকে নিচের কারণগুলো পাওয়া গেল।

কেন মানুষ প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলে?

১. রীতি-নীতি নানাভাবে সমাজের মানুষের উপকার করে। উপকারী-রীতি-নীতি সমাজে বিভিন্ন মানুষের সাথে বিভিন্ন পরিবেশে কী ধরনের আচরণ করতে হবে তা শিখতে সহযোগিতা করে। ভালো আচরণ-খারাপ আচরণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়। সমাজের দৈনন্দিন জীবন যাপনে শৃঙ্খলা রক্ষা করে।

২. মানুষ সাধারণত পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিচিতজন সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করে। তাই সে সবার পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেয়। সমাজের অধিকাংশ মানুষ সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলে বলে কারোর যদি রীতি-নীতি নিয়ে কোনো ভিন্নমত থাকে, তবুও সবার মতামত মেনে নেয়।

৩. মানুষ সাধারণত অধিকাংশ মানুষের কাজ বা চিন্তাকে সঠিক মনে করে। কোনো মানুষের পক্ষেই অধিকাংশ মানুষের পছন্দের আচরণ কী তা জানা সম্ভব নয়। মানুষ তার আশপাশের মানুষের আচরণকে অধিকাংশ মানুষের আচরণ ভেবে ভুল করে। ফলে আশপাশের মানুষের আচরণকে অধিকাংশ মানুষের পছন্দের আচরণ ভেবে তাদের আচরণ বা রীতি-নীতি মেনে চলে।

৪. মানুষ সাধারণত দলে চলতে পছন্দ করে। একটা দলের সামনের অংশ যেদিকে যায়, পেছনের অংশ পেছন থেকে দেখতে না পেয়েও দল যেদিকে যায় সেদিকেই যায়। একইভাবে সমাজের মানুষও পূর্ব-পুরুষরা যে সব রীতি-নীতি মেনে চলেছে তা বিচার-বিশ্লেষণ না করেই সবাই তো আর ভুল করতে পারে না তা ভেবে অনুকরণ করে।

৫. সাধারণত ভিন্ন চিন্তার মানুষেরা সমাজে নিজেদের সংখ্যালঘু বা সংখ্যায় কম বলে মনে করে। আর অন্যদের সংখ্যায় বেশি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মনে করে। শেষ পর্যন্ত নিজের রীতি-নীতি বদলে ফেলে অন্যদের রীতি-নীতি মেনে নেয়।

৬. অধিকাংশ মানুষ কেমন রীতি-নীতি পছন্দ করে সে সম্পর্কে মানুষ একটা অনুমান করে। প্রায়শই সে ধারণা ভুল হলেও সে সেই অনুমান অনুসারে রীতি-নীতি মেনে চলে।

৭. প্রচার মাধ্যমে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যে রীতি-নীতি মেনে চলে তা দেখে তরুণ প্রজন্ম সেটা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৮. সমাজ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের ওপর রীতি-নীতি মেনে চলার জন্য নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে।

মূল্যবোধ

পরদিন শ্রেণিকক্ষে এসে খুশি আপা বললেন, চলো আজ আমরা বই থেকে আরও কিছু ছবি দেখি। ক্লাসের সবাই মিলে নিচের ছবিগুলো দেখল।

ছবি দেখা শেষ হলে খুশি আপা সবাইকে দলে বিভক্ত হয়ে ছবিগুলো থেকে কী বোঝা গেল তা আলোচনা করে দলগতভাবে উপস্থাপন করতে বললেন।

সবাই তখন দলে বিভক্ত হয়ে নিচের ছক ব্যবহার করে তাদের চিন্তাগুলো সাজিয়ে সবার সামনে উপস্থাপন করল।

ক্রম	ছবির শিরোনাম	ছবি দেখে যা মনে হয়েছে
১.	চারপাশটা পরিচ্ছন্ন রাখি সবাই মিলে ভালো থাকি (এটা একটি উদাহরণ)	সবাই মিলে সমাজের কাজগুলো করলে সবাই মিলে ভালো থাকা যায়। (এটা একটি উদাহরণ)
২.		
৩.		

সবার উপস্থাপনা শেষ হলে খুশি আপা বললেন, তোমাদের সবার কথা থেকে বোঝা গেল যে ছবিতে কিছু সামাজিক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেখানে কোনো ব্যক্তি বা একদল মানুষ কিছু কাজ করছে। আচ্ছা বলো তো, ছবিতে যে সব কাজ দেখানো হয়েছে সেগুলো কি ভালো না মন্দ? সবাই বলল, ভালো!

খুশি আপা বললেন, কেউ যদি এই কাজগুলো করে তাহলে আমরা তাকে কেমন মানুষ বলে মনে করি? ওরা বলল, ভালো মানুষ। খুশি আপা বললেন, ভালো মানুষের কী কী বৈশিষ্ট্য ছবিগুলোয় দেখতে পাচ্ছি? ‘সামাজের সেবা করা, দয়া, মায়া, পরোপকার, সহযোগিতার মনোভাব” ওরা জবাব দিল। এবার খুশি আপা ভালো মানুষের আর কী কী বৈশিষ্ট্য হয় তা জানতে চাইলেন। জবাবে ওরা নানা রকম বৈশিষ্ট্যের কথা বলল।

খুশি আপা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আমরা জানলাম কীভাবে যে এগুলো ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য?

সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। একটু পর বুশরা বলল, বড়দের কাছ থেকে জেনেছি। আমার বাবা তো প্রায়ই আমাকে বলে, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষের উপকার করবে। এবার আস্তে আস্তে সবাই মুখ খুলতে শুরু করল। শফিক বলল, আমার খালা আমাকে বলেছে রাস্তায় যদি কোনো অসহায় মানুষ দেখো, তাহলে তাকে সাহায্য করবে।

খুশি আপা বললেন, তার মানে আমাদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী বা সমাজ আমাদের শিখিয়েছে যে এগুলো ভালো কাজ। দেখা যাচ্ছে সমাজের অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে ভালো কাজ হিসেবে মনে করছে। সবাই সহমত হলো।

খুশি আপা বললেন, এবার চলো আমরা পরিবারে ও সমাজে ভালো কাজ হিসেবে মনে করা হয়— এমন কিছু কাজ চিহ্নিত করি এবং এসব ভালো কাজ করার পেছনে যে নীতিগুলো থাকে সেগুলো খুঁজে বের করি।

ক্রম	সমাজস্বীকৃত ভালো কাজের নমুনা	নীতি
১.	বয়স্ক ব্যক্তিকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা	পরোপকার
২.	অন্যের মতামত মেনে নিতে না পারলেও শ্রদ্ধাসহ শোনা	পরমতসহিষ্ণুতা
৩.	অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না নেওয়া	
৪.		
৫.		

ওরা সবাই মিলে অনেকগুলো ভালো কাজের সমাজ স্বীকৃত নীতি খুঁজে বের করল। খুশি আপা বললেন, এই যে নীতিগুলো যার মাধ্যমে আমরা কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা খারাপ কাজ তা বুঝতে পারি তাকে ‘মূল্যবোধ’ বলা হয়।

মূল্যবোধ

সমাজস্বীকৃত যেসব নীতিমালা সাধারণভাবে সমাজের মানুষকে কোন কাজ সঠিক আর কোন কাজ ভুল, সে সম্পর্কে ধারণা দেয় তাকে মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধ মানুষকে সমাজ জীবনে কোন বিষয়গুলো মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে শেখায়।

এই মূল্যবোধগুলোর মাধ্যমে আমরা সমাজ কী গ্রহণ করবে ও করবে না সে সম্পর্কে জানাতে পারি। মূল্যবোধগুলো সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সমাজ বিভিন্নভাবে মানুষকে এসব নীতির সাথে প্রতিনিয়ত পরিচিত করায়। নানা সমাজে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধগুলো আমরা সেখানকার প্রচলিত নানান কথা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনে খুঁজে পাই। আফ্রিকার কিছু প্রবাদ শোনো-

আফ্রিকার প্রবাদ

- যে নির্দেশ মানতে চায় না, সে নেতৃত্ব দিতেও পারে না।
- সংকটের সময় বুদ্ধিমানরা সাঁকো তৈরি করে আর বোকারা বানায় দেওয়াল।
- যদি দ্রুত যেতে চাও তাহলে একা হাঁটো, আর যদি দূরে যেতে চাও তাহলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে আগাও।

চীন দেশের কিছু প্রবাদ

- যে ফুল উপহার দেয় তার হাতে কিছুটা সুগন্ধ লেগে থাকে।
- কাউকে একটা মাছ দেওয়ার মানে তুমি তাকে এক দিন খেতে দিলে, কাউকে মাছ ধরা শিখিয়ে দিলে তুমি তাকে সারা জীবন খাবার সুযোগ করে দিলে।
- তুমি যা করো তা যদি কাউকে জানতে দিতে না চাও, তাহলে সে কাজ কখন করো না।

আমাদের দেশেও এ রকম প্রবাদবাক্য আছে

- দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
- ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
- সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।

ওরা প্রবাদবাক্যগুলোর অর্থ এবং এর মধ্যকার মূল্যবোধ নিয়ে দলে আলোচনা করল। কোনোটায় পারস্পরিক সহযোগিতা, কোনোটায় সময়ানুবর্তিতার মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে। মিলি বলল, দারুণ মজার তো! আমরা যদি নানান দেশের প্রবাদবাক্যগুলো জানতে পারি, তাহলে সেই সমাজের মূল্যবোধগুলো সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পারব।

প্রবাদবাক্য	মূল্যবোধ
সংকটের সময় বুদ্ধিমানরা সাঁকো তৈরি করে আর বোকারা বানায় দেওয়াল।	পারস্পরিক সহযোগিতা
তুমি যা করো তা যদি কাউকে জানতে দিতে না চাও, তবে সে কাজ কখন করোনা।	সততা
দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।	একাত্মতা

এরপর খুশি আপা ওদের দলে ভাগ হয়ে বিদেশে থাকা পরিচিতজন, ইন্টারনেট, আশপাশের মানুষ, বিভিন্ন বই ইত্যাদি উৎস থেকে প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করে এর মধ্যকার মূল্যবোধগুলো খুঁজে বের করতে বললেন। ওরা কাজটি করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করল।

চলো, আমরাও ওদের মতো বিভিন্ন উৎস থেকে নানান দেশের প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করে মূল্যবোধগুলো খুঁজে বের করে উপস্থাপন করি।

উপস্থাপনা শেষ হলে খুশি আপা বললেন, আমি খুবই খুশি হয়েছি যে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ খুঁজে বের করতে পেরেছি। আমরা বেশ কিছু মূল্যবোধ খুঁজে বের করেছি যা আমাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হচ্ছে-

সংহতি, দেশপ্রেম, পরমতসহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, শ্রদ্ধা, সততা, মতো প্রকাশের স্বাধীনতা, পরোপকার, দয়া, শুদ্ধাচার প্রভৃতি

মামুন বলল, কিন্তু আপা আমার তো রীতি-নীতি আর মূল্যবোধ অনেকটা একই রকম মনে হচ্ছে!

রূপা বলল, আমার মনে হয়, সামাজিক রীতি-নীতি কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রে কী আচরণ করতে হবে তা জানতে সাহায্য করো যেমন- হাঁচি-কাশির সময় মুখে রুমাল অথবা টিস্যু দেওয়া কিংবা কনুই চেপে ধরা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আর মূল্যবোধ সাধারণভাবে কোন কাজ বা আচরণ ভালো আর কোনটা খারাপ সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। যেমন- সততা, পরোপকার ইত্যাদি।

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ! নিচের সারণি থেকে আমরা দেখে নিই সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য কী।

ক্রম	সামাজিক রীতি-নীতি	মূল্যবোধ
১.	কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সমাজের মানুষ কীভাবে আচরণ করবে তার আদর্শ।	কিছু নীতিমালা যা কোনো একটি সমাজের মানুষের জন্য কোন ধরনের আচরণ বা কাজ মূল্যবান বা ভালো আর কোন ধরনের আচরণ মন্দ তা বুঝতে সাহায্য করে।
২.	কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট আচরণের নির্দেশনা।	আচরণের সাধারণ নীতিমালা।
৩.	সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত আচরণ।	কোনো একজন ব্যক্তির মেনে চলা নীতি বা বিশ্বাস।
৪.	একেক সমাজে একেক রকম রীতি-নীতি দেখা যায়।	একেক ব্যক্তি একেক রকম মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয় ।
৫.	উদাহরণ:	

কারো সাথে দেখা হলে কুশল বিনিময় করা, বড়দের শ্রদ্ধা করা, হাঁচি-কাশি দেবার সময় মুখে হাত দেওয়া, কারো সাথে ধাক্কা লেগে গেলে দু:খ প্রকাশ করা প্রভৃতি।

উদাহরণ:

সততা, সাহস, দয়া, শ্রদ্ধা, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি।

খুঁজে দেখি রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ

খুশি আপা বললেন, আমরা আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় নানা রকম রীতি-নীতি আর মূল্যবোধের দেখা পাই। অরিত্রর গল্পটা থেকে চলো আমরা বিষয়টা আরো একবার বোঝার চেষ্টা করি।

স্কুলের প্রথম দিন

অরিত্র আজ প্রথম স্কুলে যাবে। মা ওকে সকাল থেকে তৈরি করছেন আর নানা রকম উপদেশ দিচ্ছেন। বলেছেন স্কুলে যাওয়ার আগে বাড়ির বড়দের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে। স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের সালাম দিতে। অরিত্র দাদিকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার পর দাদি ওকে বিশ টাকার একটা নোট দিলেন। আর বললেন, দোয়া করি, অনেক বড় হও। তখনি টিকটিকিটা টিকটিক করে উঠল। দাদি তখনই বললেন, ঠিকঠিকঠিক আর আঙুল দিয়ে টেবিলে তিনবার টোকা দিলেন। দাদিও অরিত্রকে উপদেশ দিলেন, স্কুলে ভদ্র আর শান্ত হয়ে থাকবে। কারো সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করবে না। টিফিনের কৌটা ব্যাগে ভরতে ভরতে মা বললেন, বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়ো। জিনিসপত্র ডান হাত দিয়ে দেওয়া-নেওয়া করবে। বাম হাত দিয়ে কাউকে কিছু দিয়ো না। এতসব নিয়ম-কানুনের কথা শুনে অরিত্রর একটু ভয় ভয় করতে লাগল। বাবার সঙ্গে বের হওয়ার আগে অরিত্র সবাইকে বিদায় জানাল। দরজা থেকে বের হওয়ার সময় বাবা বললেন, ডান পা আগে দাও। স্কুলে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত বাবাও ওকে যতটা সম্ভব উপদেশ দিলেন। অরিত্রর ভয়টা আরও বেড়ে গেল। স্কুলের গেট দিয়ে ঢোকার সময় দারোয়ার চাচা ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। ওর তক্ষুনি স্কুলটাকে খুব আপন লাগতে শুরু করল।

খুশি আপা বললেন, চলো, আমরা খুঁজে দেখি এই গল্পের মধ্যে কী কী রীতি-নীতি আর কী কী মূল্যবোধ খুঁজে পাই।

রীতি-নীতি	মূল্যবোধ

চলো, আমরাও ওদের মতো কাজটি করি

নির্বাচন

আজ গণেশকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তার খুব মন খারাপ। খুশি আপা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আজ কী হয়েছে? গণেশ জানাল, ওদের বাড়ির কাছে তিন বছরের একটা ছেলে খেলতে খেলতে রাস্তায় চলে গিয়েছিল। একটা গাড়ির ধাক্কায় সে মারাত্মক আহত হয়েছে। গণেশের বাবা হাসপাতালে গিয়েছিলেন ছেলেটাকে রক্ত দিতে। বাবার কাছে ও জেনেছে, ছেলেটা খুব কষ্ট পাচ্ছে। খুশি আপা জানতে চাইলেন, এত ছোট ছেলেটা রাস্তায় চলে গেল, কেউ খেয়াল করেনি? ওর বাবা-মা বড় দুই ভাই-বোনের কাছে ওকে রেখে বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা কেউ দরজা বন্ধ করেনি। ভাই ভেবেছে বোন বন্ধ করবে, বোন ভেবেছে ভাই করবে। এমনকি ছোট ভাইটা যে কোথায় আছে, সেটাও কেউ খেয়াল করেনি। দুজনই ভেবেছে, অন্যজনের কাছে আছে।

ঘটনাটা শুনে ক্লাসের সবার খুব মন খারাপ হলো। সাবা বলল, ওর ভাই-বোনদের মূল্যবোধের অভাব আছে বলে মনে হচ্ছে। “মানে?” মামুন জানতে চাইল। “ওদের একটু দায়িত্ববোধ থাকলে এ রকম ঘটনা ঘটত না” সাবা বলল। আনাই বলল, দায়িত্ববোধ নেই— এমনটা নাও হতে পারে। হয়তো এটা কেবল একটা ভুল বোঝাবুঝি। কিন্তু তার ফল হয়েছে মারাত্মক। অন্বেষা বলল, ওদের কার কী দায়িত্ব সেটা যদি ভাগ করা থাকত, কে দরজা বন্ধ করবে, কে ভাইয়ের খেয়াল রাখবে, তাহলে এই দুর্ঘটনাটা এড়ানো যেত। খুশি আপা বললেন, অন্বেষার এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ! সবাই এ বিষয়ে সহমত হলো যে, পরিবারে বা দলে দায়িত্ব ভাগ করা থাকলে কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে হয়। গৌতম বলল, আপা, আমাদের ক্লাবগুলোতে কমিটি তৈরি করে, কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ভাগ করা আছে বলেই আমরা সুন্দরভাবে কাজ করতে পারি। মিলি বলল, কিন্তু আমাদের কমিটিগুলোর মেয়াদ প্রায় শেষ হতে চলল। নতুন করে কমিটি করা দরকার।

সেদিনই ঠিক হলো, শুরুতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটি নির্বাচন হবে। দিন-তারিখও ঠিক হলো। ঠিক হলো ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই কমিটি হবে। নির্বাচনে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

সবার আলোচনার ভিত্তিতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটিতে কী কী পদ প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি হলো। নির্বাচনে কে কোন পদে মনোনয়ন চায়, তাদের নামেরও তালিকা হলো।

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটির সদস্য পদের তালিকা
সভাপতি:
সহ-সভাপতি:
সাধারণ সম্পাদক:
কোষাধ্যক্ষ:
.... সম্পাদক:
.... সম্পাদক:
.... সম্পাদক:
সদস্য ১:
সদস্য ২:
সদস্য ৩:
....

খুশি আপা বললেন, নির্বাচন যে হবে, তার আয়োজন করবে কে? নির্বাচনের আয়োজন করার জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হলো। যার নাম দেওয়া হলো নির্বাচন কমিশন। তারা নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ করল। ক্লাসের সবার নাম লিখে ভোটার তালিকা তৈরি করল। নির্বাচনের নিয়ম-কানুনও তৈরি করল। যার নাম হলো নির্বাচনী আচরণবিধি।

চলো, আম নির্বাচনী আচরণবিধি

- এমনভাবে প্রচারণ করতে হবে যেন শ্রেণি কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয়
- নির্ধারিত জায়গার বাইরে পোস্টার লাগানো যাবে না
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী কেবল একটি করে ভোট দিতে পারবে। রাও ওদের মতো কাজটি করি

নির্বাচন ঘিরে সারা স্কুলে একটা উৎসবের আমেজ! এবারের নির্বাচনে তিনটি প্যানেল অংশ নিচ্ছে। তাদের সুন্দর সুন্দর সব স্লোগান তৈরি হয়েছে।

নির্বাচনের জন্য পোস্টার, স্লোগান তৈরি, প্রচার-প্রচারণার জন্য গান গাওয়া, বক্তৃতা করায় সবার খুব উৎসাহ! নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলগুলো নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহারও বানিয়েছে। তাদের প্যানেল নির্বাচনে জয়ী হলে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য কী কী কাজ করা হবে তার বর্ণনা এই ইশতেহারে লেখা আছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি লিখে প্লাকার্ডও বানানো হয়েছে। টিফিনের সময় প্লাকার্ড হাতে মিছিল হয় রোজ।

স্কুলের ছোট-বড় সবার মুখে পুঁথির সুরের এই নির্বাচনী গান,

শোনো শোনো বন্ধুরা সব, শোনো দিয়া মন,
বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের হবে নির্বাচন
সবার ভোটে সফল হবে এমন আয়োজন।
সঠিক লোকের সঠিক পদে থাকা প্রয়োজন
চিন্তা করে ভোট দিয়ো তাই সুধী সর্বজন।

অবশেষে নির্বাচনের দিন এসে গেল। ওই দিন নির্বাচন কমিশন প্রচার-প্রচারণা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তারা প্রার্থীর প্রতীকসহ ব্যালট পেপার তৈরি করেছে।

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব নির্বাচন

প্রার্থীর নাম	প্রতীক	সিল দেওয়ার স্থান
ক		
খ		
গ		

সবার মনেই আজ উৎসবের আনন্দ! শতভাগ ভোট পড়েছে! আজ সপ্তম শ্রেণির কেউ অনুপস্থিত নেই। সবাই সক্রিয় নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে।

ভোটগ্রহণ শেষ হলে স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় ভোট গণনা করা হলো। এক একজন বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়, আর সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে। সবার নাম ঘোষণার পর বিজয়ীদের অভিনন্দন জানানো হলো। সুন্দর একটা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষকগণ ওদের প্রশংসা করলেন।

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের নামের তালিকা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

চলো আমরাও ওদের মতো নিচের ধাপ অনুসরণ করে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের নির্বাচনের আয়োজন করি।

- সবার আলোচনার ভিত্তিতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটিতে কী কী পদ প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি করা
- বিভিন্ন পদপ্রার্থীর একাধিক প্যানেল তৈরি করা
- নির্বাচন কমিশন গঠন করে তাদের নির্বাচনের নিয়ম-কানুন ও ব্যালট পেপার তৈরি করতে দেওয়া, নির্বাচনের আয়োজন করতে কমিশনকে সহযোগিতা করা
- স্লোগান, ইশতেহার, পোস্টার, প্লাকার্ড, গান ইত্যাদি তৈরি করে নির্বাচনী প্রচারণা করা
- নির্বাচন অনুষ্ঠান করে, ভোট দিয়ে কমিটি নির্বাচন করে, কমিটির সদস্যদের নাম নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া

খুশি আপা বললেন, আমরা যেভাবে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের কমিটি নির্বাচন করেছি, বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য নির্বাচনও এভাবে হয়। বাংলাদেশের আইনসভাকে 'সংসদ' বলা হয়। তবে আমাদের নির্বাচন আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে কিছু তফাতও আছে। সংসদ নির্বাচনে

- ভোট দিতে পারে কমপক্ষে আঠারো বছর বয়সী বাংলাদেশি নাগরিকরা
- রাজনৈতিক দল থেকে অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যায়
- বাংলাদেশকে তিন শত আসনে ভাগ করা হয়। প্রতিটি আসন থেকে একজন করে মোট ৩০০' জন সংসদ সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন
- নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংবিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত নারী আসনে পঞ্চাশজন নারী সাংসদকে নির্বাচন করেন তারা রাষ্ট্রপতিও নির্বাচন করেন প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি

মাহবুব জানতে চাইল, আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্লাব কমিটি গঠন করে ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনা করব। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে কী হয়? জবাবে খুশি আপা বললেন, সংসদ অর্থাৎ আইনসভার সদস্যদের বাছাই করা হয়।

অন্বেষা বলল, চলো, আমরা প্রথমে পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন বই, ইন্টারনেট, শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তি যারা এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানেন তাদের সহযোগিতা নিয়ে অনুসন্ধানী কাজ করি। মিল-অমিলের ছক ব্যবহার করে দেখতে পারি আমাদের ক্লাবের নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় অমিল আছে।

খুশি আপা বোর্ডে নিচের ছকটি আঁকলেন। বললেন, ছকের বামদিকে আমরা আমাদের নির্বাচন নিয়ে লিখব আর ডানদিকে লিখব জাতীয় নির্বাচনের কথা। আর যে বিষয়টি দুই নির্বাচনেই এক রকম সেটি বসাব মাঝখানে। এ রকম ছককে ‘ভেন রেখাচিত্র’ বলে।

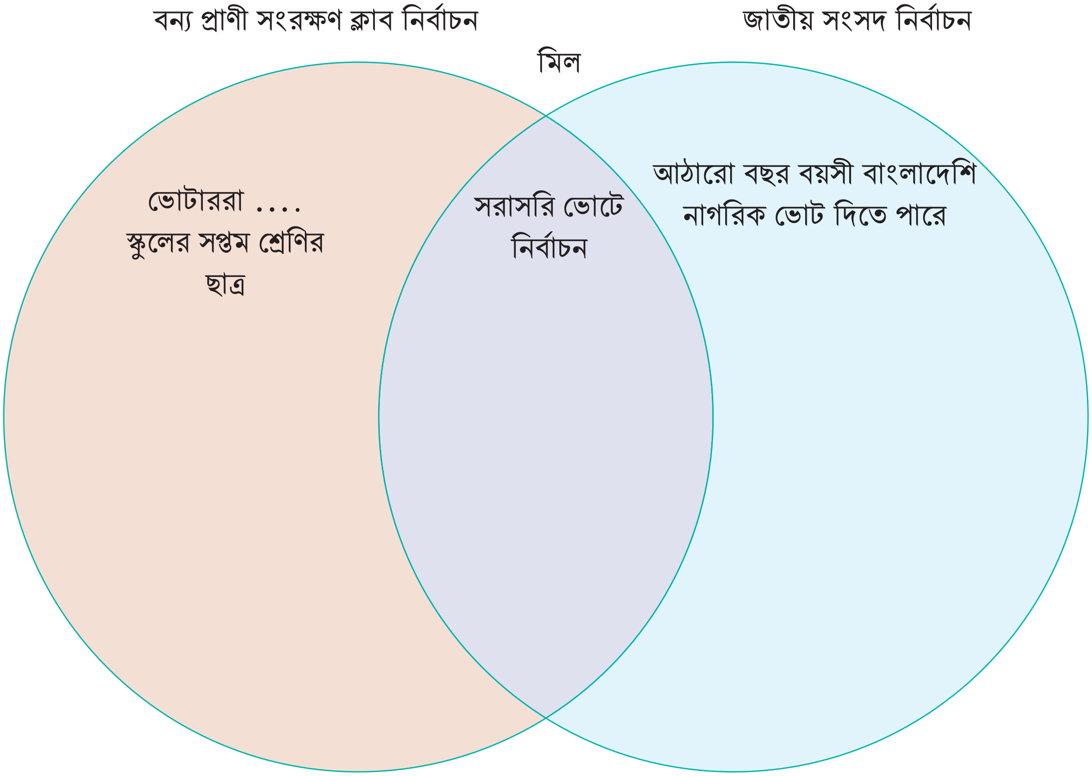

চলো, আমরাও ওদের মতো দুটো নির্বাচনের মধ্যকার মিল-অমিলের ছকটি পূরণ করি।

সালমা বলল, সংসদ নির্বাচন আর আমাদের নির্বাচনের মধ্যে যত তফাতই থাক, একটা মিল কিন্তু দারুণ! দুই জায়গায়ই ভোটের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থী নির্বাচন করা যায়। তাতে সবার মতামত দেওয়ার সুযোগ হয়। সেই প্রার্থীরা সবার পক্ষ থেকে সংসদে কথা বলছে। অর্থাৎ সবারই মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

ছায়া সংসদে 'পথের প্রাণী' বিষয়ক আইন

আনুচিং বলল, আমি খবরে দেখেছি, নওগাঁর পাহাড়পুর জাদুঘর এলাকায় কিছু শিয়াল আছে। শিয়াল তো এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। ওই জাদুঘরের কাস্টডিয়ান ফজলুল করিম আরজু তার সহকর্মীদের নিয়ে শিয়ালগুলোকে প্রতিদিন খাবার দেয়। বাচ্চা শিয়ালদের দেখেশুনে রাখে। ফাতেমা আনাইয়ের কথায় সায় দিতে যাচ্ছিল, এরমধ্যে গৌতম বলল, শিয়াল খুঁজে পাওয়া তো মুশকিল! শিহান বলল, শিয়াল না পাই, পথে পথে তো অনেক অসহায় কুকুর থাকে। ওদের খাবার, আশ্রয়, চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা ওদের জন্য কাজ করতে পারি। হাচ্চা বলল, আমাদের এলাকায় একটা বিড়াল থাকে। সে সবার বাড়ি থেকে খাবার চুরি করে খায়। সে জন্য লোকের হাতে মারও খায়। সেদিন পাশের বাড়ির একজন বলছিল, "ধরতে পারলে বিড়ালটাকে মেরেই ফেলব। " ওই বিড়ালটাকে কি আমরা রক্ষা করতে পারি? সালমা বলল, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে আমরা পথের বিড়াল-কুকুরদের সাহায্য করতে পারি। সুমন বলল, আমাদের পাশের বাড়িতে একটা পাখিকে খাঁচায় আটকে রেখে বাড়ির লোকজন বেড়াতে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে পাখিটা মরে গিয়েছে। আমরা খাঁচার পাখিদেরও রক্ষা করতে পারি। গণেশ বলল, পথের বিড়াল-কুকুর নোংরা জিনিসপত্র খায়, ওরা জীবাণু ছড়ায়। সুযোগ পেলে কামড়েও দিতে পারে। আমরা বরং খাঁচার পাখিকে বাঁচাতে কাজ করি। গণেশের কথায়ও কয়েকজন সায় দিল।

খুশি আপা যখন ক্লাসে এলেন, তখনও তর্কটা চলছে। খুশি আপা বললেন, আমরা তো ক্লাবের মাধ্যমেই এই সংকটের সমাধান করতে পারি! শফিক বলল, আপা, আমরা কোন কাজটা করব সেটা জানা থাকলে ক্লাব কাজ করতে পারত। কিন্তু পথের কুকুর-বিড়ালকে নিয়ে কাজ করব নাকি খাঁচার পাখি— সেই সিদ্ধান্তই তো এখনও নিতে পারিনি। খুশি আপা বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই টেলিভিশনে জাতীয় সংসদের অধিবেশন দেখেছ? আমরা ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে জাতীয় সংসদের আদলে 'ছায়া সংসদ' তৈরি করতে পারি। সেখানে পথের কুকুর বিড়ালকে আমরা সাহায্য করব নাকি খাঁচার পাখি, সেই বিষয়টি বিল আকারে আসতে পারে। ওরা দারুণ উৎসাহ প্রকাশ করল। খুশি হয়ে খুশি আপা বললেন, এবার তাহলে সংসদে বসে আমরা নতুন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের এই শ্রেণিকক্ষই হবে আইনসভা।

ক্লাব নির্বাচনে বিজয়ীদের মধ্য থেকে সাধারণ সম্পাদককে করা হলো রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি ক্লাবের নির্বাচিত সভাপতিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাব নিয়োগ দিল। প্রধানমন্ত্রী আইনমন্ত্রী, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রমুখ মনোনয়ন করল। রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দিল। একজন স্পিকারও নিযুক্ত হলো। বিজয়ী প্যানেলের বাকিরা সরকারী দলের সাংসদ আর অন্যরা বিরোধী দলের সাংসদ হলো। সাবা বলল, বাহ্! আমরা তো সরকার তৈরি করে ফেললাম!

কয়েকজন সংসদ সদস্য মিলে আলোচনার ভিত্তিতে "বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব যে-কোনো গৃহহীন প্রাণীকে সাহায্য করবে, এমনকি যদি কোনো মানুষ তার পোষা প্রাণীর ঠিকমতো যত্ন না নেয়, সেক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেবে" এই মর্মে আইনের একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করল। এরপর বিরোধী দলের একজন সদস্য আইনের খসড়াটি সংসদে বিল আকারে উপস্থাপন করল। সরকারী ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল। সবশেষে স্পিকার মৌখিক ভোটের আয়োজন করল। কণ্ঠভোটে "হ্যাঁ" জয়যুক্ত হলো। আইনটি লিখিতভাবে পেশ করা হলে রাষ্ট্রপতির তাতে স্বাক্ষর করল। এভাবে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের একটি আইন তৈরি হলো।

আইনটি প্রণীত হওয়ার পর পথের কুকুর-বিড়াল কিংবা খাঁচার পাখি—কাউকে নিয়ে কাজ করতেই ওদের আর কোনো বাধা থাকল না। তবে আইনে একটি শর্তও রয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বড়দের পরামর্শ নিতে হবে এবং সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এরপর ওরা দলগতভাবে নিচের ছক ব্যবহার করে সারা বছর কী কাজ করবে তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করল

ক্রম	কাজের বিবরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	এলাকায় যাদের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে	কোন এলাকায় কাজটি করা হবে	সময়কাল
	বন্য প্রাণীদের আবাস ও খাবারের প্রাকৃতিক উৎস নিশ্চিত করার জন্য গাছ লাগানো				
	বাড়ির বাড়তি খাবার পথের প্রাণীদের দেওয়ার জন্য প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি করে পানির পাত্র ও খাবারের পাত্র রাখা				
	শিশু ও অসুস্থ প্রাণীদের জন্য সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা				
	পশু চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে বিনা খরচে/স্বল্প খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা				
	পথের প্রাণীদের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ দূর করতে ও খাঁচার পাখিকে অবমুক্ত করতে জনসচেতনামূলক পোস্টার তৈরি করা				
	খাঁচার পাখি যারা বিক্রি করে তাদের এই কাজ থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করা				

চলো আমরাও ওদের মতন ছায়া সংসদে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে আইন প্রণয়ন করি এবং ওদের সুরক্ষার জন্য উপরের ছকটি ব্যবহার করে নিজেদের পরিকল্পনা তৈরি করি।

সরকারের বিভাগসমূহ

নীলা বলল, আমরা তো সরকার গঠন করলাম, আইনও তৈরি করলাম, কিন্তু আইন যদি কেউ না মানে তাহলে কী হবে?

খুশি আপা বললেন, সরকার তিনটি বিভাগের মাধ্যমে কাজ করে। খুশি আপা ওদের একটা পোস্টার দেখালেন।

আইন বিভাগ: আইন তৈরি ও সংশোধন করে। দেশের সারা বছরের আয়-ব্যায়ের হিসাব করে বাজেট তৈরি করে।

শাসন বিভাগ: রাষ্ট্রের মধ্যে আইনকে প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের স্থায়ী কর্মচারীদের নিয়োগ করে।

বিচার বিভাগ: কেউ আইন ভঙ্গ করলে তার বিচার করে

খুশি আপা এবার ওদের আর একটা পোস্টার দেখালেন। জানতে চাইলেন, কী দেখতে পাচ্ছ? "সরকার যেমন একটা প্রতিষ্ঠান, সে আবার আলাদা আলাদা তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে। "সরকার নিজেও আর একটা প্রতিষ্ঠানের অংশ। সেটি হলো রাষ্ট্র বা দেশ। " রূপা বলল। খুশি আপা বললেন, দারূণ বলেছ!

খুশি আপা তখন ওদের আরও কিছু ছবি দেখিয়ে বললেন, একটা রাষ্ট্র তৈরি হতে গেলে এই উপাদানগুলো লাগে।

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

- একটা রাষ্ট্র হতে হলে সরকারের সঙ্গে নির্দষ্ট ভূ-খন্ড, জনগণ আর সার্ব (বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ ছাড়া কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা) ।
- রাষ্ট্র তার সব ইচ্ছা বা কাজ সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে।
- সাধারণভাবে রাষ্ট্রকে কোথাও দেখা যায় না।
- কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডে, যখন অন্য যে কোনো রাষ্ট্র বা শক্তির নিয়ন্ত্রণহীনভাবে জনগণের ওপর আইন প্রয়োগ করে বা জনগণের কল্যাণ করার জন্য বিভিন্ন কাজ করে তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।
- রাষ্ট্র একটি ভূখন্ডের জনগণের সবার ইচ্ছায় গড়ে তোলা একটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
- রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণ।

প্রতিষ্ঠানে মূল্যবোধ

খুশি আপা জানতে চাইলেন, নির্বাচন আর ছায়া সংসদের অভিজ্ঞতা কেমন লাগল? ওরা বলল, আমাদের খুব ভালো লেগেছে! দারূণ মজা হয়েছে!! আচ্ছা, আমরা যে নির্বাচন করলাম, সরকার গঠন করলাম, ছায়া

সংসদে বিল পাস করলাম, সেখানেও কি মূল্যবোধ, রীতি-নীতি কাজ করেছে? খুঁজে দেখি। ওরা খুঁজে বের করে একটা তালিকা তৈরি করল।

সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রীতি-নীতি মূল্যবোধ

ক্রম	কাজের বিবরণ	দায়িত্বশীল সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম	সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের নাম
১	অন্যকে মতো প্রকাশ করতে দেওয়া	......	গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
২	নিজের মতো প্রকাশ করা	......	...
৩	সবার মতকে সম্মান করা	......	....
৪	অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা	......	
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			
১১			

ওপরের ছক ব্যবহার করে আমরাও আমাদের নির্বাচন, ছায়া সংসদের অভিজ্ঞতা, রাষ্ট্র ও সরকার সংক্রান্ত কাজ থেকে পাওয়া মূল্যবোধগুলোর একটা তালিকা তৈরি করি।

সালমা বলল, কিন্তু আপা, টেলিভিশনের সংসদ অধিবেশনে আমরা দেখেছি সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা কথা বলেন। আমাদের ছায়া-সংসদে তো কোনো সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ছিল না! খুশি আপা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সংসদে যদি কোনো মেয়েই না থাকত তাহলে কেমন হতো? ওরা সবাই বলল যে, ব্যাপারটা মোটেও ভালো হতো না। “কেন ভালো হতো না?” খুশি আপার প্রশ্ন। ওরা বলল, কেবল ছেলেরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে, মেয়েরা পাবে না, এটা অন্যায়। ছেলে-মেয়ে সবারই সবকিছুতে সমান অধিকার আছে ইত্যাদি। “আমার তো মনে হয়, মেয়েদের ভোট দেওয়ার অধিকারই থাকা উচিত না” খুশি আপা বললেন,। খুশি আপার কথা ওরা কেউ মেনে নিতে পারল না। সবাই মিলে তর্ক জুড়ে দিল। খুশি আপা জোড় দিয়ে বললেন, মেয়েরা ঘর-সংসার সামলাবে, দেশ কীভাবে চলবে সেটা দেখা তাদের কাজ না, তারা এতটা মেধাবীও না। তাদের রাজনীতিতে আসা একেবারেই উচিত না। ওরা খুশি আপার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল!

তারপর খুশি আপা হেসে বললেন, আজ থেকে এক-দেড় শ’ বছর আগেও মানুষ এ রকমই মনে করত। তোমরা যদি সেই সময়ের মানুষ হতে, তাহলে আমার কথাকে পুরোপুরি ঠিক বলে মনে করতে।

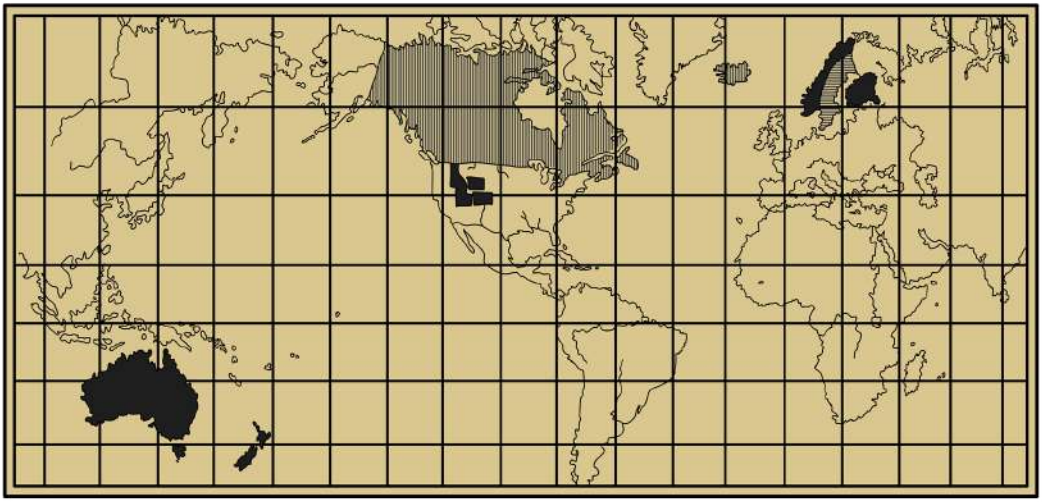

১৯০৮ সালেও কেবল পৃথিবীর কালো চিহ্নিত অংশটুকু সমস্ত নারীদের ভোটাধিকার ছিল

একসময় অস্ট্রেলিয়ায় আইন অনুযায়ী কেবল যাদের গায়ের রং সাদা কেবল তারাই ভোট দিতে পারত। “এ রকম অদ্ভুত আইন কেন!” ওরা অবাক হলো। খুশি আপা বললেন, খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছ। আচ্ছা মনে আছে তো আইন কারা তৈরি করে? কীভাবে তৈরি করে?

সিয়াম বলে উঠল, আইনসভায় তৈরি হয়! আইনসভার সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে!

গৌতম বলল, কিন্তু আইনসভার সদস্যরা তো সমাজের সবার মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়! মানুষ তাহলে অমন প্রার্থীদের ভোট দিত কেন? সালমা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল, তার মানে কি তখনকার মানুষের সামাজিক রীতি-নীতি-মূল্যবোধও ঐ রকম ছিলো!! তখন খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক রামমোহন রায় এর জীবনীর অংশবিশেষ পড়ে দেখি মানুষের মাঝে সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ কীভাবে কাজ করে? আর কীভাবেইবা তা সময়ের সাথে বদলে যায়।

রামমোহন রায়

তোমরা হয়তো রামমোহন রায়ের নাম শুনেছ। তাঁকে বলা হয় প্রথম আধুনিক বাঙালি। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার এক বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারে। প্রথমে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখলেও নিজের আগ্রহে ফারসি ও আরবি ভাষা শেখেন। এই দুই ভাষা তিনি এত ভালো রপ্ত করেছিলেন যে অনেকে ঠাট্টা করে তাঁকে ডাকতো ‘মৌলভী রামমোহন’।

তবে এই দূরদর্শী তরুণের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য ইংরেজি ভাষা শেখা জরুরি। ফলে রামমোহন

এক ইংরেজের কাছে ভালোভাবে ভাষাটি আয়ত্ত করেন। তিনি দেশে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে কাজ করেছেন।

এই সময় ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে একটি অত্যন্ত অমানবিক কুপ্রথা চালু ছিল। এটি হলো সতীদাহ বা সহমরণ। এই ব্যবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো। রামমোহন এই প্রথাটি বন্ধে উদ্যোগী হন। তখন বাংলায় ইংরেজ শাসন চলছে, তাঁরা প্রথাটির বিরুদ্ধে থাকলেও এদেশীয় একটি প্রচলিত ব্যবস্থা বদলানোর উদ্যোগ নিজেরা গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু রামমোহন সতীদাহ প্রথা বন্ধে ইংরেজ শাসকের সহযোগিতা কামনা করেন।

এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও রামমোহনের ভাবনায় এই প্রথাবিরোধী বিদ্রোহী ভাব তৈরি হওয়ার পেছনে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কাজ করেছে। তাঁর দাদা জগমোহন রায়ের স্ত্রী ছিলেন অলকমণি দেবী। রামমোহন এই বউদিকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন। দাদা জগমোহন অকালে মারা গেলে সামাজিক চাপে বউদি অলকমণিকে চিতায় পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা হয়। তিনি নিজে সতী হতে চাননি। খবর পেয়ে রামমোহন বউদিকে বাঁচাবার জন্য ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি পৌঁছবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। তিনি কেবল দেখলেন ঢাকের শব্দে, ধুনোর ধোঁয়ায় পৈশাচিক আনন্দে জনতা চিৎকার করছে - জয় সতী অলকমণির জয়।

“বউদির চিতার পাশে পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়ালেন রামমোহন। এক চোখে আগুন, আর এক চোখে জল নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে যে-কোনো মূল্যে ভারতবর্ষ থেকে নারী হত্যার এই পৈশাচিক প্রথা তিনি চিরদিনের মতো লোপ করে দেবেন। ”

এই ঘটনা তুলে ধরে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন- “বউদির চিতার পাশে পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়ালেন রামমোহন। এক চোখে আগুন, আর এক চোখে জল নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে যে-কোনো মূল্যে ভারতবর্ষ থেকে নারী হত্যার এই পৈশাচিক প্রথা তিনি চিরদিনের মতো লোপ করে দেবেন। ”

দার্শনিক ও ভাবুক হলেও রামমোহন ছিলেন একজন বাস্তববোধসম্পন্ন কর্মী মানুষ। ফলে সেদিনের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে তিনি কাজ শুরু করলেন। শাস্ত্রের যুক্তি দেখিয়েই তিনি রচনা করলেন "সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ"। তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিত প্রচার শুরু করে সামাজিক প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়। তবে রামমোহন উদারচিত্তের সাহসী মানুষ ছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় সেই সময় ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল হিসেবে এসেছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস আর সত্যনিষ্ঠার জন্যে রামমোহনকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে তখন হিন্দু সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অনেক রাজা-মহারাজা এর বিরুদ্ধে থাকলেও কোনো কোনো শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত তাঁর পক্ষে ছিলেন। ফলে রক্ষণশীল সমাজের ব্যাপক প্রচারণার মধ্যেও রামমোহনের জয় হলো। ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন পাস হয়ে গেল। এ আইন বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়তো আরো কয়েক বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ রকম একটি অমানবিক কুপ্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছিল।

সতীদাহ কী ধরনের সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করত তার এক চিত্র পাওয়া যায়, কথাসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কেরী সাহেবের মুন্সি'তে। সেই অংশটুকু পড়লে আমরা এই প্রথা যে কতটা অমানবিক এবং নিষ্ঠুর ছিল তা বুঝতে পারব—-

"এমন সময় অভাবিত এক কাণ্ড ঘটল।

তীরে কোলাহল উঠল - 'গেল গেল, পালাল পালাল, ধর ধর!'

নৌকার আরোহীরা চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখে যে তীরে একটি ছোটখাটো জনতা; কিন্তু কে পালাল কাকে ধরতে হবে, সে রহস্য উদ্ধার করার আগেই তারা দেখল নদীর জলে একটি মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে

নৌকার দিকে আসছে। সবাই বুঝল তাকে ধরার উদ্দেশ্যেই কোলাহল। মেয়েটি নৌকার কাছে এসে পড়েছে এমন সময় খান দুই ডিঙি করে জন কয়েক লোক তাকে ধরার জন্য এগোল। কিন্তু ডিঙি তাকে ধরার আগেই মেয়েটি কেরীর বজরার কাছে এসে আর্তস্বরে বলে উঠল, বাঁচাও, বাঁচাও। ওরা পেলে আমায় পুড়িয়ে মারবে।

পরমুহূর্তে কেরীকে লক্ষ্য করে মেয়েটি বলে উঠল - সাহেব, দোহাই তোমার, আমাকে রক্ষা করো!

কেরীর ইঙ্গিতে রাম বসু মেয়েটিকে টেনে তুলে ফেলল নৌকায়।

সবাই দেখলে বিচিত্র তার বেশ, বিচিত্র তার সজ্জা, বিচিত্র তার রূপ। ভয়ে উদ্বেগে সে রূপ সহস্রগুণ উজ্জ্বল। প্রকৃত সৌন্দর্য দু:খে সুন্দরতর হয়। ঝড়ের আকাশে চন্দ্রকলা মধুরতর।

তার বেশভূষা দেখে রাম বসু বলে ওঠে, এ যে দেখছি বিয়ের সাজ! তুমি কি বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এসেছ?

রক্তিম ঠোঁটের ভঙ্গিতে গোলাপ ফুল ফুটিয়ে মেয়েটি বলে - বিয়ে কাল রাতে হয়েছে, আজ এনেছিল চিতায় পুড়িয়ে মারতে।

হতবুদ্ধি রাম বসু শুধায়, বর হঠাৎ মারা গেল?

হঠাৎ নয়, একটা মড়ার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিল, এখন বলে কি না ঐ মড়াটার সঙ্গে আমাকে পুড়ে মরতে হবে!

বহু যুগের সংস্কার, রাম বসু বলে ওঠে, চিতা থেকে পালাতে গেলে কেন?

চিরন্তন জীবনাগ্রহে মেয়েটির মুখ কথা বলে ওঠে - আমার মরতে বড় ভয় করে।

তারপরে একবার পেছন ফিরে দেখে কেরীর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে ব্যাকুলতায় ভেঙে পড়ে বলে - সাহেব, রক্ষা করো - ওরা একবার ধরলে আর রক্ষা থাকবে না, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

ডিঙির আরোহীদের মধ্যে কৃশকায় একটি লোককে দেখিয়ে বলে - ঐ চণ্ডীখুড়ো সব নষ্টের গোড়া। দোহাই সাহেব, ওর হাতে আমাকে ছেড়ে দিয়ো না, দোহাই তোমার!

সমস্ত ব্যাপার দেখে কেরীর বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটির আর্তব্যাকুলতায় এতক্ষণে তার বাক্স্ফূর্তি হলো - কেরী বলল, ‘তুম ডরো মৎ, ঐ মিনসের হাতে তোমাকে আমি ছাড়ব না। ”

সতীদাহ প্রথা বন্ধের আইনটি বিলেতের পিভি কাউন্সিলে পাশ হওয়ার আগে রক্ষণশীল নেতারা রামমোহনের প্রয়াসকে বাধা দেওয়ার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা রাজা-মহারাজা ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতসহ প্রায় আটশত বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদন পাঠিয়েছিলেন বিলেতে। কিন্তু রামমোহন স্বয়ং বিলেতে এসে ক্ষুরধার যুক্তিতে বিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করে আইনটি পাসের পথে সব বাধা দূর করেন।

রাজা রামমোহন রায়কে এ উপমহাদেশের একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করার আরও অনেক কারণ রয়েছে। বিলেতে অবস্থানের সময় তিনি ইংল্যান্ডের রিফর্ম বা সংস্কার বিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অধিকারের পক্ষে অনেকগুলো সুপারিশ তুলে ধরেছিলেন। আইনসভার ইংরেজ সদস্যদের

অনেকে তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন। তিনি এদেশে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষার প্রসারের বিশ্বাস করতেন। নারীদের জন্যে আধুনিক শিক্ষার আয়োজনেও তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। রামমোহন নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং মেয়েরা যেন সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে তার পক্ষেও কাজ করেছেন। এছাড়া বাংলা গদ্যের সূচনাকারীদের অন্যতম একজন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন রায়ের জীবনী পড়া শেষ হলে ওরা দলগতভাবে নিচের ছক ব্যবহার করে সামাজিক রীতি-নীতি কীভাবে পরিবর্তন হলো তার প্রক্রিয়াটি নিজের ভাষায় লিখে উপস্থাপন করল।

কীভাবে সামাজিক রীতি-নীতি পরিবর্তিত হয়?

এ পর্যায়ে খুশি আপা বললেন, আচ্ছা চলো তাহলে আমরা এ বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করি। হুর রে!! সবাই খুশি হয়ে উঠল। তারপর সবাই মিলে বির্তকের বিষয় ঠিক করল।

বিতর্কের বিষয়

১. কেবল আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব সব মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

২. নারীর কাজ ঘর সামলানো আর পুরুষের কাজ রাষ্ট্র পরিচালনা

৩. সব মানুষের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই, কেবল বুদ্ধিমানের মতামতই শোনা উচিত।

৪. ....

৫. ....

বিতর্ক শেষে খুশি আপা যারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেনি তাদের মুক্ত আলোচনায় আহ্বান করলেন।

সে আলোচনায় ওরা সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আইন, সরকার— এসবের বদল নিয়ে মুক্ত আলোচনা করল।

আনাই বলল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক কাঠামোয় কত রকম বদল হয়! এই বদলগুলো হয় কী করে?

মিলি বলল, আমাদের এলাকায় একটা মেয়ের বিয়ের কথা হয়েছিল। ওর বাবা-মা রাজিও ছিল। কিন্তু মেয়েটার বয়স মাত্র পনেরো বলে বিয়েটা আর দেয়নি। কারণ ওর চাচা বাঁধা দিয়েছে। বলেছে, এখন বাল্যবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। যখন আইনে বাধা ছিল না তখন অনেক ছোটবেলায় ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। সিয়াম বলল, আচ্ছা, তাহলে তো আইন-কানুনও মূল্যবোধ ও রীতি-নীতিকে প্রভাবিত করে!

খুশি আপা বললেন, সমাজের অগ্রসরমাণ অংশের আন্দোলনের ফলেও মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন হয়। আর চিন্তার পরিবর্তন থেকে রীতি-নীতি আর মূল্যবোধেও পরিবর্তন আসে। অতীতকাল থেকেই অনেক মানুষ আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি আর মূল্যবোধের পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ। তাঁরা চাপ তৈরির মাধ্যমে সমাজের অনেক রীতি-নীতিতে বদল এনেছেন বলে তাঁদের ‘চাপসৃষ্টিকারী’ গোষ্ঠীও বলা যায়।

আলোচনা শেষে ওরা ঠিক করল, বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দেশ-বিদেশের সমসাময়িক ঘটনা এবং অতীত ইতিহাস থেকে সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে ওরা অনুসন্ধানমূলক কাজ করবে। ওরা এই অনুশীলন বইয়ের “যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কীভাবে?” অংশ থেকে শেখা পদ্ধতি অনুসরণ করল। প্রথমে তারা নিচের ছকে লিখিত প্রশ্নের মতো অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করল।

১. রাষ্ট্র, সরকার, আইন কীভাবে রীতি-নীতি ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে
২. রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ কীভাবে রাষ্ট্র, সরকার, আইনকে প্রভাবিত করে
৩. ....
৪. ....

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপ অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহের জন্য বই, পত্রপত্রিকা, ইন্টারনেট ও সাক্ষাৎকারের সাহায্য নিয়ে তারা তাদের অনুসন্ধানী কাজটি করল। এরপর ওরা বিষয় অনুযায়ী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করল।

অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে আমরাও ওদের মতো নিজেদের অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করে এ বিষয়ে অনুসন্ধান কাজের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করে উপস্থাপন করতে পারি।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা

অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকা

শুক্রবারের সকালবেলায় স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা হবে। কে কে যাবে তাই নিয়ে ক্লাসে আলাপ হচ্ছিল। প্রায় সবাই যেতে চায়। হঠাৎ সুমন কাগজ দিয়ে একটা মস্ত গোঁফ বানিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, আমি যেখানে খুশি যেতে পারি, কারোর অনুমতি লাগে না। ওর ভাবভঙ্গি দেখে বন্ধুরা সব হেসেই কুটিপাটি! সুমন ধমক দিয়ে বলল, এত হাসির কী হলো? ধমক শুনে ওরা আরও জোরে হেসে উঠল। তবে সবাই স্বীকার করল, সুমনকে দারূণ মানিয়েছে! গণেশ বলল, এ রকম গোঁফ লাগিয়ে সত্যি সত্যি বাবার মতো বড় হওয়া গেলে আমিও লাগাতাম।

এই সময় খুশি আপা এলেন। তিনি বললেন, ছোটবেলায় আমিও এ রকম ভেবেছি। খুশি আপা ওদের ফুটবল মাঠের ফরমেশনের একটা ছবি দেখলেন।

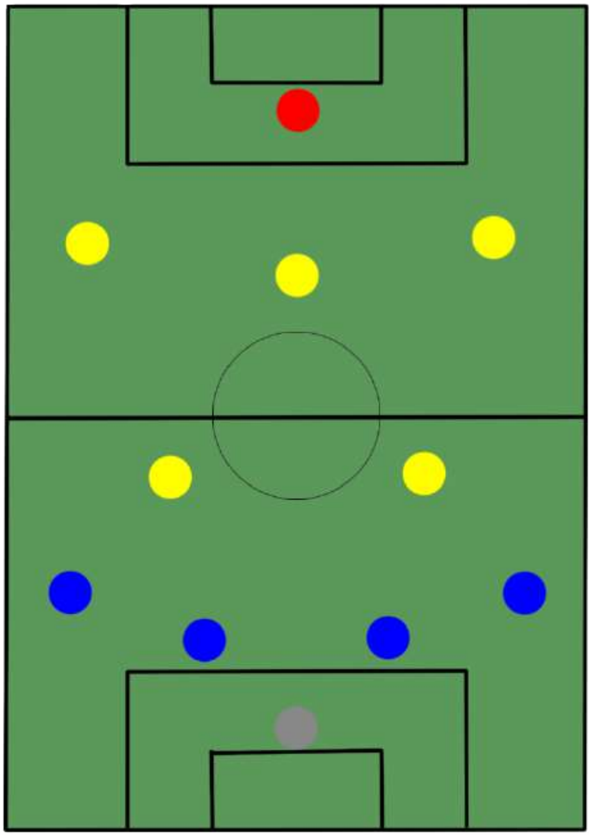

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে গোলরক্ষকের অবস্থান কোথায়? আনাই জবাব দিল, গোলরক্ষকের অবস্থান নিজেদের গোলপোস্টের সামনে। খুশি আপা বললেন, আর সেন্টার ফরোয়ার্ডের অবস্থান? হাচ্চা বলল, সেন্টার ফরোয়ার্ডের অবস্থান বিপক্ষ দলের গোলপোস্টের কাছে। খুশি আপা বললেন, চমৎকার! এবার বলো, ফুটবল খেলায় গোলরক্ষকের ভূমিকা কী? মামুন বলল, বিপক্ষ দলকে গোল দিতে বাধা দেওয়া। "বাহ্! সেন্টার ফরোয়ার্ডের ভূমিকা কী, বলো তো?" খুশি আপা আবার প্রশ্ন করলেন। মাহবুব বলল, গোল দেওয়া।

এবারে খুশি আপা বললেন, যদি এমন হয়, খেলার সময় এরা যার যার অবস্থানে থাকল ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ গোলরক্ষকের মনে হলো, "আর কত গোল ঠেকাব! এবার বরং একটা গোল দিই। " অন্যদিকে সেন্টার ফরোয়ার্ডের মনে হলো, "সারা জীবন কি কেবল গোলই করে যাব! এবার বরং দএকটা গোল ঠেকাই। " তারা তখন নিজেদের ভূমিকা বদলে ফেলল, তাহলে কেমন হবে? তিনি বোর্ডে একটা ছক আঁকলেন।

	অবস্থান	মূল ভূমিকা	পরিবর্তিত ভূমিকা
গোলরক্ষক	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	গোল দিতে বাধা দেওয়া	গোল দেওয়া
সেন্টার ফরোয়ার্ড	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	গোল দেওয়া	গোল দিতে বাধা দেওয়া

তারপর বললেন, আবার যদি অন্যরকম হয়। তারা দুজনই ভাবল, “এক জায়গায় আর কত খেলব! যাই, একটু অন্যদিকে খেলি। ” গোলরক্ষক আর সেন্টার ফরোয়ার্ড দুজনে দুজনার অবস্থান অদল বদল করল কিন্তু তাদের ভূমিকা ঠিক থাকল। তাহলেই বা কী ঘটবে? তিনি আরও একটা ছক আঁকলেন।

	মূল অবস্থান	পরিবর্তিত অবস্থান	ভূমিকা
গোলরক্ষক	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	গোল দিতে বাধা দেওয়া
সেন্টার ফরোয়ার্ড	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	গোল দেওয়া

ছকদুটো দেখে ওরা হেসে ফেলল। আদনান বলল, শুক্রবারের খেলায় যদি এ রকম ঘটনা ঘটে তাহলে কী ভীষণ কান্ড হবে! সালমা বলল, অত কান্ডের কোনো দরকার নেই। যে যার অবস্থানে থেকে নিজের ভূমিকা ঠিকঠাক পালন করলে আমরা মজা করে খেলা দেখতে পারব।

আমরাও ছক দুটো ভালো করে দেখি আর আলোচনা করি, ইচ্ছেমতো অবস্থান কিংবা ভূমিকা বদলালে কী ঘটনা ঘটবে।

ছোটবেলার অবস্থান ও ভূমিকা বড় হলে বদলায়

খুশি আপা বললেন, অবস্থান আর ভূমিকা বদল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গল্প আছে। তিনি ওদের গল্পটা শোনালেন।

ইচ্ছা পূরণ

সুবলচন্দ্রের ছেলে সুশীলচন্দ্র ভারি দস্যি। সবাইকে জ্বালিয়ে মারত। সেদিন ছিল ওদের পাড়ায় জমজমাট উৎসব। সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো হবে। সুশীলের ইচ্ছে সেখানেই সারা দিন কাটাবে। তাই সে বুদ্ধি করে বাবাকে বলল, আমার পেট ব্যাথা। আজ স্কুলে যাব না। বাবা সবই বুঝতে পারল। তবু বলল, আজ তাহলে ঘর থেকে বের হয়ে কাজ নেই। তোর জন্য লজঞ্চুস (চকলেট) এনেছিলাম সেটাও আর খেতে হবে না। বরং পাঁচন খেয়ে সারা দিন শুয়ে থাক। পাঁচন একটা ভয়ানক তিতা ওষুধ। পাঁচনের ভয়ে সুশীলের পেটব্যথা সেরে গেল, কিন্তু সুবল তাকে ছাড়ল না। জোর করে পাঁচন খাইয়ে ঘর বন্ধ করে চলে গেল। মনের দু:খে সুশীল সারা দিন কাঁদল আর ভাবল, যদি আমার বাবার মতো বয়স হতো, তাহলে কী মজা হতো! যা ইচ্ছে তাই করতে পারতাম। এদিকে সুবল ভাবল, যদি ছেলেবেলাটা ফিরে পেতাম, তাহলে সারা দিন শুধু লেখাপড়া করতাম। ইচ্ছা ঠাকরুণ সেকথা শুনে ভাবলেন, ঠিক আছে। এদের যেমন ইচ্ছে তেমনই হোক।

পরদিন সকালে সুবল ঘুম থেকে উঠে দেখে তার টাক মাথায় চুল গজিয়েছে, পড়ে যাওয়া দাঁতগুলোও গজিয়েছে। মুখে একটাও গোঁফদাড়ি নেই। সে একদম সুশীলের মতো ছোট হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে সুশীলের হলো উল্টোরকম ব্যাপার। মাথায় চকচকে টাক, মুখে গোঁফদাঁড়ির জঙ্গল, কয়েকটা দাঁতও পড়ে গেছে। আর শরীরটা কত বড় হয়ে গেছে! তাদের মনের একটা ইচ্ছা পূরণ হলো ঠিকই কিন্তু বাকি ইচ্ছাগুলো হারিয়ে গেল। সুশীল ভাবত বাবার মতো হলে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারবে, সারা দিন হাডুডু খেলা, পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ায় আর গাছে চড়ায় কোনো বারণ থাকবে না। কিন্তু বড় হয়ে তার আর এসব করতেই ইচ্ছে হলো না।

তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে গেল। পথচলতি লোকেরা বুড়ো মানুষের এই ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুশীলের কত প্রিয় ছিল লজঞ্চুস, এক টাকায় একরাশ লজঞ্চুস কিনে এনে একটা মুখে দিয়ে স্বাদটা ভারি বিশ্রী লাগল। এমনকি নিজের বন্ধুদের দেখেও ছেলেমানুষ আর বিরক্তিকর বলে মনে হলো।

এদিকে যে সুবল ভেবেছিল আবার ছোট হতে পারলে কত পড়াশোনা করবে, এমনকি সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুমার কাছে গল্প শোনা বাদ দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কেবলই পড়া মুখস্থ করবে। অথচ এখন সে আর কিছুতেই স্কুলে যেতে চায় না। সারা দিন খেলার জন্য অস্থির থাকে। সুশীল তাকে জোর করে স্কুলে পাঠায়। কাজের সময় গোলমাল করলে একটা স্লেট নিয়ে অঙ্ক করতে বসিয়ে দেয়, এমনকি বন্ধুদের সঙ্গে দাবা খেলার সময় ছেলেকে শান্ত রাখার জন্য বাড়িতে একজন মাস্টারও রেখে দিল। তবুও বাবা সুবলকে সামলাতে গিয়ে ছেলে সুশীল হিমশিম খায়।

পুরোনো অভ্যাসের কারণে দুজনের মাঝে মাঝেই আবার ভুল হয়ে যায়। সুশীল চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখে মাথায় চুলই নেই। হঠাৎ করে লাফ দিতে গিয়ে হাড়গোড় টনটন করে ওঠে। আগের অভ্যাসমতো পাড়ার আন্দিপিসির মাটির কলসে ঠন করে ঢিল ছুড়ে মেরে পাড়ার লোকের তাড়া খায়। এদিকে সুবল বড়দের তাস-পাশার আড্ডায় বসতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে আসে। ভুল করে মাস্টারের কাছে তামাকটা চেয়ে মার খায়। নাপিতকে বলে, কদিন আমার দাড়ি কামাতে আসিসনি যে! বুড়োর ছেলে মানুষি আর ছোট ছেলের পাকামি দেখে লোকজন খুব বিরক্ত হয়।

আগে সুশীল কোথাও যাত্রাগান হওয়ার খবর পেলে ঠান্ডা-বৃষ্টি যা-ই থাক, বাড়ি থেকে পালিয়ে সেখানে হাজির হতো। এখন সেই কাজ করতে গিয়ে জ্বর-সর্দি-কাশি বাধিয়ে তিন সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকল। চিরকালের অভ্যাসমতো পুকুরে স্নান করতে গিয়ে এমন অসুখ বাধাল যে ছয় মাস চিকিৎসা করতে হলো। তারপর সে আর সুবলকেও পুকুরে নামতে দেয় না।

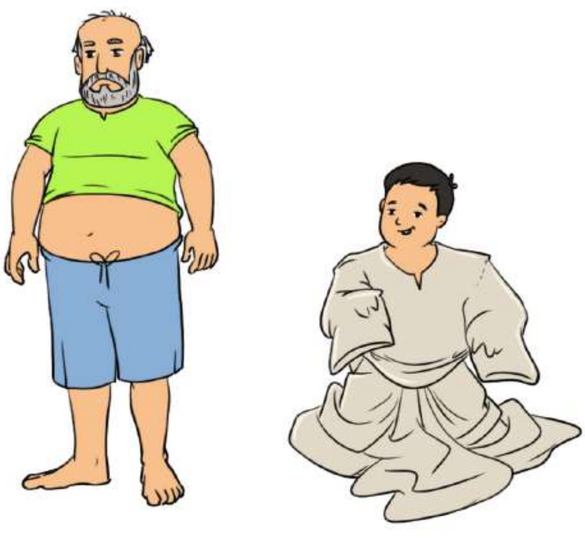

সুবল-সুশীলের আর ভালো লাগছিল না। তারা কোনোমতে আগের মতো হতে পারলে বেঁচে যায়। ইচ্ছা ঠাকরুণ ওদের ইচ্ছার কথা জেনে আবার দুজনকে আগের মতো করে দিলেন। সুবল আবার বাবা হয়েই গম্ভীর হয়ে সুশীলকে বলল, ব্যাকরণ মুখস্ত করবে না? সুশীল আগের মতোই জবাব দিল, বই হারিয়ে গিয়েছে।

গল্পটা বলার পর খুশি আপা বললেন, আমাদের সুমন যেমন গোঁফ লাগিয়ে বড় মানুষ সেজেছে, 'ইচ্ছা পূরণ' গল্পে এ রকম ঘটনা কার ক্ষেত্রে ঘটেছে? অন্বেষা হেসে বলল, সুশীলচন্দ্র সুমনের

মতো ছেলে থেকে বাবা হয়েছে। মামুন বলল, সুবলচন্দ্রের ক্ষেত্রে আবার উল্টো ঘটনা ঘটেছে, সে বাবা থেকে ছেলে হয়ে গিয়েছে। খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই। চলো, আমরা একটা ছক পূরণ করে বুঝে নিই, ছেলে হিসেবে সুশীল-সুবল কেমন ছিল আর বাবা হিসেবে তারা কেমন হয়েছিল। ওরা আলোচনার মাধ্যমে বোর্ডে নিচের ছকটি পূরণ করল:

অদল-বদল	
সুশীলচন্দ্র যখন ছেলে	সুশীলচন্দ্র যখন বাবা
পড়াশোনায় ফাঁকি দেয় বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে, গাছে চড়তে ভালো লাগে	ছেলেকে পড়তে বসায় ছেলেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে
সুবলচন্দ্র যখন ছেলে	সুবলচন্দ্র যখন বাবা
পড়াশোনায় ফাঁকি দেয় বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে, গাছে চড়তে ভালো লাগে	ছেলেকে পড়তে বসায় ছেলেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে

আমরাও ওদের মতো আলোচনা করে ওপরের ছকটি পূরণ করি।

ছক পূরণ শেষে ওরা নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করল

সুবলচন্দ্র আর সুশীলচন্দ্রের কী রকম বদল হয়েছিল?

যখন তারা বাবা তখন তাদের কাজ, আচরণ কেমন ছিল?

যখন তারা ছেলে তখন তারা কেমন?

লোকজন ওদের ওপর বিরক্ত হয়েছিল কেন?

আলোচনা শেষে ওরা বুঝতে পারল, সুবলচন্দ্র ও সুশীলচন্দ্রের অবস্থান বদল হওয়ার পর তাদের ভূমিকারও বদল হয়েছে। বাবা হিসেবে সুবলচন্দ্র যা করতে পারে, ছেলে হিসেবে তা পারে না। যেমন গোলরক্ষকের অবস্থানে থেকে সেন্টার ফরোয়ার্ডের ভূমিকা পালন করা যায় না। আবার সুশীলচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি। বাবা ও ছেলের অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকা পালনের কিছু সামাজিক রীতি-নীতি আছে। সেগুলো মেনে

না চললে সমাজের লোকজন বিরক্ত হয়, তেড়ে আসে। ফুটবলের মাঠেও নিয়ম নীতি মেনে না খেললে এ রকম কাণ্ড ঘটে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার বদল হয়

খুশি আপা বললেন, আমরা তো গল্পে দেখলাম বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থান বদলায় আর অবস্থান বদলালে ভূমিকাও বদলায়। কিন্তু বাস্তবেও এ রকম হয় কি না, আমরা একটা অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে পারি, ছোটবেলায় আর পরিণত বয়সে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা কেমন হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য নিজেদের পরিবারের লোকজনসহ আশপাশের পাঁচজন বড় মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে পারি। আমরা বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষের সঙ্গে কথা বলব। যত ভিন্ন ভিন্ন রকমের মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে পারব, তত ভালোভাবে বিষয়টা বুঝতে পারব। সমাজের সব রকমের মানুষের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা সত্যি কি না, জানা যাবে।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ওরা আলোচনার মাধ্যমে এ রকম একটা ছক তৈরি করল:

বিভিন্ন বয়সে আমার অবস্থান ও ভূমিকা নাম: বয়স:	পেশা: লিঙ্গ:
স্কুলে পড়ার বয়সে আমি যা করতাম	এখন আমি যা করি

ওরা দল তৈরি করে অনুসন্ধানী কাজটি করল। তারপর বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করল।

আমরাও ওদের মতো অনুসন্ধানী কাজটি করি।

উপস্থাপন শেষে ফ্রান্সিস বলল, আমরা যে ভাবছিলাম, বড় হলে খেলা দেখতে যেতে কারোর অনুমতি লাগবে না। কত স্বাধীনতা! কিন্তু আসলে বড়দের অবস্থানে যে ভূমিকা পালন করতে হয়, তাতে দায়িত্বও বেশি থাকে। নীলা বলল, বাড়িতে, অফিসে, ক্লাবে, বাজারে নানা জায়গায় তাদের অনেকগুলো অবস্থানে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়। শিহান বলল, ছোটদের ক্ষেত্রেও সে কথা সত্যি। খুশি আপা বললেন, কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বলবে? “বাড়িতে আমরা ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ইত্যাদি অবস্থানে একাধিক ভূমিকায় থাকি, আবার স্কুলে এসে ছাত্র, বন্ধু— এসব অবস্থানে ভূমিকা পালন করি। ” শিহান জবাব দিল। খুশি আপা আনন্দিত হয়ে বললেন, দারূণ বলেছ তো! আরও বললেন,

এই যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সঙ্গে মেলামেশা বা যোগাযোগ করি, যে পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সেটা করি তাকে ‘সামাজিক প্রেক্ষাপট’ বলে।

আয়েশা বলল, আমরা বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি, অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকার কী রকম বদল হচ্ছে। সিয়াম বলল, আমরা কমিক স্ট্রিপ বানিয়ে বিষয়টা সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারি।

বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমার অবস্থান ও ভূমিকা

এরপর ওরা শিরোনাম আর কথার বেলুন দিয়ে কার্টুন একে নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলো ক্লাসে উপস্থাপন করল।

বাড়িতে আমি	শ্রেণিকক্ষে আমি
(ঘর গোছানো, ঘুমানো, ছোট ভাই/বোনের সঙ্গে খেলার ছবি, স্পিচ বাবলে লেখা) ছোট বোনকে গল্প শোনাই	(হাত তুলে কথা বলা, বন্ধুদের সঙ্গে কাগজ পেন্সিল রঙ কাচি দিয়ে প্রজেক্ট ওয়ার্ক করার ছবি, স্পিচ বাবলে লেখা) বন্ধুদের সঙ্গে কাজ করি
খেলার মাঠে আমি	বন্ধুদের আড্ডায় আমি

আমরাও ওদের মতন কার্টুন একে 'বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের অবস্থান ও ভূমিকা' প্রকাশ করি।

ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা

সাবা বলল, আমাদের যেমন আলাদা আলাদা সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলাদা আলাদা অবস্থান ও ভূমিকা আছে, আমরা যে পরিবারের আর আশপাশের মানুষের সাক্ষাৎকার নিলাম, তাদেরও তো ছোটবেলায় এ রকম সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থান আর বিভিন্ন ভূমিকা ছিল। অন্বেষা বলল, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের অবস্থান বদলেছে, অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় ভূমিকারও বদল ঘটেছে। "বড় হয়ে কি তাদের সবার অবস্থান আর ভূমিকা একরকম হয়েছে?" খুশি আপা প্রশ্ন করলেন। গণেশ বলল, ব্যক্তির যেমন বয়সভেদে আলাদা অবস্থান ও ভূমিকা থাকে, তেমনি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও অবস্থান আর ভূমিকার তফাত আছে। সালমা বলল, বড়দের সবার অবস্থান আর ভূমিকা একরকম না। মা যা করে বাবা সেটা করে না। মাহবুব বলল, আমাদের এলাকার জনপ্রতিনিধি যা যা করেন, দোকানদার সেটা করেন না। একজন অভিনেতা যা করতে পারেন, মসজিদের ইমাম সাহেব তা করতে পারেন না; সমাজের মানুষও সেটা মেনে নেবে

না। আনুচিং বলল, ধনী আর দরিদ্র মানুষের অবস্থান ও ভূমিকায়ও পার্থক্য হয়। আমি একজন শিল্পপতির সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তিনি ছোটবেলায় দরিদ্র ছিলেন; অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এখন তিনি দরিদ্রদের পড়াশোনা, চিকিৎসা ইত্যাদির খরচ দেন। বুশরা বলল, আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আমি তাকে ব্যক্তির অবস্থান এবং ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার কথাগুলো বলেছি। তার সঙ্গে করা আলাপ আর আজকের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আমি বুঝেছি:

মানুষের সঙ্গে মানুষের কথাবার্তা, কাজ, ভাবের বিনিময় ইত্যাদি যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রতিষ্ঠান (পরিবার, বিদ্যালয়, আমলাতন্ত্র, ধর্ম, রাজনৈতিক দল) এবং গোষ্ঠী (খেলার সঙ্গী, ফুটবল টিম, প্রতিবেশী) তৈরি হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীতে ব্যক্তি অবস্থান (status) করে ও ভূমিকা (role) পালন করে।

ব্যক্তির অবস্থান দুই রকমের হতে পারে:

- অর্জিত- যা ব্যক্তি সক্ষমতা ও চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করে। যেমন- বিচারপতির পদ, প্রধানমন্ত্রীত্ব, খেলোয়াড়
- অর্পিত- জন্মসূত্রে বা প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত বিষয়। যেমন- নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, হরিজন-ব্রাহ্মণ

অবস্থান অনুযায়ী ব্যক্তির যে অধিকার ও দায়িত্ব থাকে তাকে আমরা ভূমিকা বলি। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মানুষের অবস্থান অনুযায়ী সমাজ তার কাছে যে আচরণ প্রত্যাশা করে সেটিই তার ভূমিকা। তাই সুবল যখন ছেলে হয়েছিল, তখন মাস্টারের কাছে তামাক চেয়ে মার খেয়েছিল । প্রত্যেক মানুষের একই সময় আবার জীবনের বিভিন্ন সময় পারিবারিক, পেশাগত ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো অবস্থান ও ভূমিকা থাকে।

একই সমাজের সকল মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা এক নয়। একজন মানুষের অবস্থান নির্ধারিত হয় তার পরিচিতি, সুনাম, পদ, ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক মর্যাদা, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে। একজন মানুষকে সমাজের অন্যান্য মানুষ কীভাবে মূল্যায়ন করবে, কতটা সম্মান ও গুরুত্ব দেবে তা তার সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।

আলোচনা শেষে আদনান বলল, আমাদেরও তাহলে বড় হয়ে অবস্থান এবং ভূমিকা বদলাবে। আয়েশা বলল, আপনা আপনি সব বদলাবে তেমনটা নয়, আমাদের নিজেদেরও পছন্দের অবস্থান অর্জন করতে হবে। রনি বলল, আমরা তো সুশীলের মতো এক রাতে বড় হব না, ধীরে ধীরে বাড়ব, ধীরে ধীরে পছন্দের অবস্থান তৈরি করব। সাবা হেসে বলল, সে-ই ভালো। তাহলে আর হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে হাড়গোড় ভাঙবে না। সবাই হেসে উঠল।

খুশি আপা বললেন, আমরা তো এখনকার সময়ের বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা দেখলাম। এবার একটু অতীতে ফিরে দেখি, সেই সময় বিষয়গুলো কেমন ছিল। তিনি ওদের ষষ্ঠ শ্রেণির অনুসন্ধানী পাঠ থেকে মিশর, মেসোপটেমিয়া, গ্রিক এবং রোমান সভ্যতা সম্পর্কে পড়ে আসতে বললেন।

নানা সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা

পরের দিনের ক্লাসে খুশি আপা ওদের একটা ছবি দেখালেন। সুমন বলল, এইরকম একটা ছবি আমরা ষষ্ঠ শ্রেণির অনুসন্ধানী পাঠ-এ দেখেছি। রূপা বলল, প্রাচীন মিশরের সমাজে কাজ অনুযায়ী মানুষে মানুষে এ রকম

শ্রেণিবিভাগ ছিল।

মামুন বলল, এই পিরামিডের সবচেয়ে নিচে যাদের দেখছি, প্রাচীন মিশরীয় সমাজে তাদের অবস্থান ছিল সবচেয়ে নিচে, সম্মান আর সম্পদও ছিল সবচেয়ে কম। তাদের ভূমিকা ছিল সেবকের, অর্থাৎ অন্যের সেবা করাই ছিল তাদের কাজ। শিহান বলল, পিরামিডের সবচেয়ে ওপরে আছে রাজা। সমাজে তার অবস্থান এবং সম্মান ছিল সবচেয়ে ওপরে। তার সম্পদও ছিল সবচেয়ে বেশি। তার ভূমিকা ছিল শাসকের।

খুশি আপা বললেন, প্রাচীন মিশরীয় সমাজের মতো আমাদের সমাজেও তো নানা রকম মানুষ আছে—গৃহকর্মী, রিকশাওয়ালা, ডাক্তার, ইমাম, সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, অবসরপ্রাপ্ত মানুষ, বিজ্ঞানী। তাদের পদ, ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক মর্যাদা, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদির আছে রকমফের। আমরা এখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান আর ভূমিকাও খুঁজে দেখতে পারি। "আমরা একটা দলীয় অনুসন্ধানী কাজ করতে পারি" নীলা প্রস্তাব দিল। সবাই মিলে এ বিষয়ে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করল।

১.
২.
৩.
৪.

'যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো' অধ্যায় থেকে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুযায়ী অনুসন্ধানী কাজ করল এবং কাজের ফলাফল বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করল।

চলো এবার 'যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় কীভাবে?' অধ্যায় থেকে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুযায়ী অনুসন্ধানী কাজটি করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করি। তার পর নিচের ছক ব্যবহার করে প্রাচীন মিশরের সমাজের মানুষের সামাজিক ভূমিকার সাথে বর্তমান সময়ের সমাজের মানুষের ভূমিকার মিল-অমিল খুঁজে বের করি।

প্রাচীন মিশরের মানুষের সমাজের ভূমিকার সাথে বর্তমান সময়ের সমাজের মানুষের ভূমিকার মিল	প্রাচীন মিশরের মানুষের সমাজের ভূমিকার সাথে বর্তমান সময়ের সমাজের মানুষের ভূমিকার অমিল

সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল হলে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা বদলায়

খুশি আপা জানতে চাইলেন, সামাজিক প্রেক্ষাপট কি সবসময় একই রকম থাকে? ওরা বলল, প্রাচীনকালের সামাজিক প্রেক্ষাপট আর আজকের প্রেক্ষাপট একরকম না। হাচ্চা বলল, সব কালের সমাজে বয়স অনুযায়ী মানুষের অবস্থান এবং ভূমিকার বদল হয়। কিন্তু সামাজিক অবস্থানের শ্রেণিভেদ সবসময় ছিল না। আপা বললেন, সমাজের কোনো একটি শ্রেণির আজকের যে অবস্থান এবং ভূমিকা, আগেও কি তেমন ছিল, ভবিষ্যতেও কি তেমন থাকবে? ওরা 'হ্যাঁ' 'না' দুটোই বলল, কিন্তু একমত হতে পারল না।

খুশি আপা বললেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যখন ছোট ছিলেন, সমাজে নারীদের জন্য ছিল কঠোর পর্দাপ্রথা। তিনি নিজেও যখন খুব ছোট ছিলেন, তখন বাড়ির বাইরে তো বটেই, এমনকি বাড়ির ভেতরেও তাঁকে পর্দা মেনে চলতে হতো। তাঁর লেখা 'অবরোধবাসিনী' বইয়ে তিনি প্রায় একশ বছর আগেকার নারীদের অবরুদ্ধ অবস্থানের কথা কিছু কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে তুলে এনেছেন। বইয়ের শুরুতে তিনি বলেছেন, "গোটা ভারতবর্ষের কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, মেয়েমানুষের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরানি ব্যতীত অপর কোনো স্ত্রীলোক দেখিতে পায় না। বিবাহিতা নারীগণও বাজিকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দা করিয়া থাকেন। " খুশি আপা ওদের 'অবরোধবাসিনী' থেকে কয়েকটা কাহিনি শোনালেন।

অবরোধবাসিনীর কাহিনি

১. এক বাড়িতে আগুন লেগেছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি সব গয়না একটা বাক্সে ভরে ঘরের বাইরে বের হলেন। দরজায় এসে দেখলেন একদল পুরুষ আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। তিনি তাদের সামনে বের না হয়ে আবার ঘরের ভেতরে গিয়ে খাটের নিচে বসলেন। সেই অবস্থায় পুড়ে মরলেন। তবু পুরুষের সামনে বের হলেন না।

২. এক ভদ্রমহিলা ট্রেন বদলের সময় বোরকায় জড়িয়ে ট্রেন আর প্লাটফরমের মাঝখানে পড়ে গেলেন। স্টেশনে সে সময় তার গৃহপরিচারিকা ছাড়া আর কোনো নারী ছিল না। স্টেশনের কুলিরা তাকে তোলার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু গৃহপরিচারিকা বললেন, "খবর্দার! কেউ বিবি সাহেবার গায়ে হাত দিয়ো না। " কিন্তু সে একা অনেক টানাটানি করেও কিছুতেই তাকে তুলতে পারল না। প্রায় আধাঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেনের চাকার তলায় পিষে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

৩. একজন ডাক্তার গিয়েছেন রোগী দেখতে। ভদ্রমহিলার নিউমোনিয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন পর্দার আড়ালে। ডাক্তার বললেন, স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে ফুসফুসের অবস্থা দেখতে হবে; আমি পিঠের দিক থেকে দেখে নেব। কিন্তু ডাক্তারকে বলা হলো, স্টেথিস্কোপের নল গৃহপরিচারিকার হাতে দিতে। তিনি যেখানে যেখানে বলবেন, পরিচারিকা সেখানে নল রাখবে। তিনি পিঠে রাখবে বলে স্টেথিস্কোপের নলকে পর্দার ওপারে পাঠালেন। অনেকক্ষণ পরেও কোনো শব্দ শুনতে না পেয়ে পর্দা একটু সরিয়ে দেখলেন, নলটা কোমরে রাখা হয়েছে। তিনি বিরক্ত হয়ে ফিরে এলেন।

৪. জমিদার পরিবারের বিশ-পঁচিশজন মোটা মোটা কাপড়ের বোরকা পরা নারী হজে যাবার পথে কলকাতা স্টেশনে এলেন। তাদের স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসালে লোকে দেখতে পাবে। তাই প্লাটফরমে উপুর করে বসিয়ে মস্ত ভারী শতরঞ্জি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। তাদের সঙ্গে থাকা হাজি সাহেব একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলেন। তারা ওই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা থাকার পরে ট্রেন আসার সময় হলো। রেলের একজন কর্মচারী হাজি সাহেবকে তার আসবাবপত্র সরিয়ে নিতে বললেন। হাজি সাহেব বললেন, ওইসব আসবাব না, বাড়ির মেয়েরা। কর্মাচারীটি আবারও একটি 'বস্তায়' লাথি দিয়ে ওগুলো সরাতে বললেন। ভেতরে থাকা মেয়েরা লাথি খেয়েও টুঁ শব্দ করেনি।

৫. একবার এক লেডিস কনফারেন্স উপলক্ষে রোকেয়া আলীগড় গিয়েছিলেন। সেখানে এক ভদ্রমহিলার বোরকার প্রশংসা করায় তিনি বোরকা সম্পর্কে নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার গল্প বললেন। একবার এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। সেখানকার ছেলে-মেয়েরা তাকে বোরকাসহ দেখে ভয়ে চিৎকার করে পালিয়েছিল। তিনি একবার কলকাতায় এসে আরও কয়েকজন বোরকাপরা নারীর সঙ্গে খোলা মোটরগাড়িতে পথে বের হয়েছিলেন। কলকাতার পথের ছেলেরাও তাদের ভূত মনে করে ছুটে পালিয়েছিল।

কাহিনি বলা শেষ হলে রূপা বলল, সেই সময় সব নারী কিন্তু অবরোধবাসিনী ছিল না। রোকেয়ার কথায় আমরা 'তামাশাওয়ালী' নারীদের কথা পেয়েছি, তারা নিশ্চয়ই লোকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে মজার কিছু দেখাতেন। গণেশ বলল, ঠিক কথা, আমরা তো সেই সময় লেডিস কনফারেন্স হওয়ার কথাও পেলাম। খাদিজা বলল, ছোটবেলায় অবরোধবাসিনী হিসেবে কাটালেও বড় হয়ে রোকেয়া কিন্তু অনেক কাজ করেছিলেন! গৌতম বলল, সে জন্য

তাঁকে তো অনেক লড়াইও করতে হয়েছে। তাঁর মতো অবস্থানে গিয়ে ভূমিকা রাখাটা তখনকার নারীর জন্য নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। গণেশ বলল, ওই সময় নারীর সামাজিক অবস্থান এবং ভূমিকা মূলত ঘরের মধ্যেই ছিল বলে মনে হচ্ছে। ঘরের বাইরের কাজে যারা এসেছে, তারা ব্যতিক্রমী।

খুশি আপা ওদের বললেন, এসব কাহিনি থেকে ওই সময়ের নারীদের অবস্থান এবং ভূমিকা কেমন ছিল বলে মনে করছি তা দলগতভাবে খুঁজে বের করি, চলো। ওরা কাজটি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করল।

প্রায় ১০০ বছর আগেকার নারীর সামাজিক অবস্থান	প্রায় ১০০ বছর আগেকার নারীর সামাজিক ভূমিকা

আমরাও দলগতভাবে কাজটি করি।

খুশি আপা বললেন, এবার আমরা এই সময়ের নারীদের ওপরে একটা তথ্যচিত্র দেখব এবং রিপোর্ট পড়ব।

কলসিন্দুর থেকে হিমালয়ে

সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ এ বিজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল

সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২২ সালের আসরে স্বাগতিক নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের এই আসরে বাংলাদেশের মেয়েরা গোল করেছে মোট তেইশটি, হজম করেছে মাত্র একটি। সাফের ষষ্ঠ আসরের সবগুলো পুরস্কারই বাংলাদেশের ঝুলিতে। এই দলের আটজন খেলোয়াড় এসেছে ময়মনসিংহের কলসিন্দুর নামের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে। ফুটবলকন্যাদের বদৌলতে কলসিন্দুর এখন সারা দেশের এক পরিচিত নাম। গ্রামীণ বালিকা থেকে সুপারস্টার হয়ে ওঠা এই মেয়েরা নিজেদের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপরিমণ্ডলে দেশের অবস্থানতেও নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়।

কলসিন্দুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে ছোট্ট মেয়েগুলোর কাছে "মেয়েরা ফুটবল খেলে" এই কথাই ছিল বিস্ময়ের, আজ ফুটবলের পঙ্খিরাজে চড়ে তারা নিজেরাই সবার কাছে বিস্ময়। অখ্যাত গ্রাম কলসিন্দুর থেকে হিমালয়কন্যা নেপালে গিয়ে সাফ জয়, যেমন ছিল পথটা— ২০১১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ঘোষণা দেওয়া হয় 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট' আয়োজনের। ময়মনসিংহ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উপজেলা ধোবাউরার কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মফিজউদ্দিন খবরটা জানতে পেরে নিজের স্কুলের জন্য দল গঠনে লেগে যান। একে একে দলে যোগ দেয় সানজিদা, মারিয়া মান্দা, শিউলি আজিম, মার্জিয়া আক্তার, শামসুন্নাহার, তহুরা সাজেদা, শামসুন্নাহার জুনিয়র। মফিজউদ্দিন নিজেই ছিলেন প্রশিক্ষক। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিনতি রানি শীল দেখভালের দায়িত্ব নেন। ২০১২ সালে জেলায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট শুরু হলে কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে অংশ নেয়। জাতীয় পর্যায়ে রানার্স আপ হয় তারা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য শুরু করে নতুন করে প্রস্তুতি। মফিজউদ্দিন জানান, শুরুটা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। গ্রামের অভিভাবকরা

রক্ষণশীল। মেয়েদের ফুটবল খেলতে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। অভিভাবকদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। এরপর মেয়েদের নিয়ে যখন মাঠে নেমেছেন, অনেকেই ঠাট্টা-মশকারা করেছে। মেয়েদের নিয়ে অনেক সমালোচনা, আজেবাজে মন্তব্য করেছে। প্র্যাকটিসের সময় মাঠের আশপাশে থাকত উৎসুক মানুষের ভির। অনেকেই তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। তবে সাহায্য করতেও এগিয়ে এসেছেন অনেকে। লোকের তির্যক মন্তব্যের জবাব মুখে নয়, মাঠে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। মেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুল ছুটির পরও বন্ধের দিনে মাঠে প্রাকটিস করতে থাকে। শিক্ষক মফিজউদ্দিনের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। ২০১৩ সালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরপরও একধিকবার তারা এই পদক জিতেছে। এই সময় স্থানীয় প্রশাসক ও ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিদের নজরে আসে সানজিদা, মারিয়ারা। অল্প করে হলেও মিলতে থাকে সুযোগ-সুবিধা। ২০১৪ সালে এএফসি অনূর্ধ্ব ১৪ আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে মারিয়া মান্দা, শামসুন্নাহার জুনিয়র। কলসিন্দুর স্কুলের মেয়েদের এমন সাফল্য দেখে অন্য মেয়ে শিক্ষার্থীরাও ফুটবলে আগ্রহী হয়। দিন দিন বাড়তে থাকে কলসিন্দুর স্কুল টিমের সদস্য সংখ্যা। কলসিন্দুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিনতি রানি শীল জানান, শুরুতে প্রধান সমস্যা ছিল পোশাক নিয়ে সংকোচ। মেয়েরা প্রথমে সালোয়ার-কামিজ পরে খেলত। লোকলজ্জার ভয় দূর করে খেলার পোশাকে মেয়েদের মাঠে নামাতে অনেক সময় লেগেছে। সানজিদার বাবা লিয়াকত আলী জানান, মেয়ের আগ্রহ ও শিক্ষকদের কথার কারণে মেয়েকে ফুটবল খেলতে দিয়েছেন। গ্রামের লোকজন প্রথমে বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। খেলোয়াড়দের নানা হুমকি-ধামকি দেওয়া হয়েছে। এমনকি নির্যাতনও করা হয়েছে। পরে যখন নারীদের ফুটবলে এগিয়ে যাওয়ার কারণে কলসিন্দুর গ্রামের নামডাক ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে, তখন সমস্যা অনেক কমেছে, সম্মান-স্বীকৃতিও মিলেছে। অজপাড়াগাঁয়ের কয়েকটা মেয়ে গ্রামের চেহারাই বদলে দিয়েছে। তাদের খ্যাতির কারণে সেখানে বিদ্যুৎ এসেছে, পাকা হয়েছে রাস্তাঘাট। তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাকা ভবন হয়েছে, ফুটবলকন্যাদের বদৌলতে সরকারীকরণ হয়েছে কলসিন্দুর স্কুল এন্ড কলেজ। সেখানেও উঠেছে পাকা ভবন। দরিদ্র পরিবারের মেয়েগুলো নিজেদের সংসারে এনেছে স্বচ্ছলতা। তাদের কারণে আলোকিত হয়েছে এই জনপদ; মাথা উঁচু হয়েছে পুরো জাতির। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মেয়েদের সংবর্ধনাসহ আর্থিক অনুদানও দিয়েছেন। এই কিশোরীদের গল্প উচ্চ মাধ্যমিক শাখার একাদশ শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'দ্য আনবিটেন গার্লস' বা 'অপরাজিত মেয়েরা' শিরোনামে পাঠ্যবইয়ে একটি বিশেষ পাঠ রাখা হয়েছে। গারো পাহাড়ের পাদদেশের দরিদ্র পরিবারগুলো থেকে উঠে আসা ফুটবলার মেয়েদের সফলতার গল্প লেখা হয়েছে এই পাঠে। আরও কিছু ক্যাপশনসহ ছবি দেখে নিই।

সরকার পরিচালনায় নারী

আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার যে, মাত্রই ১৩০ বছর আগে আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীর অবস্থান ছিল শুধু অন্তঃপুরে সেখানে আজ বাংলাদেশের সরকার পরিচালনাতেও নারীরা যোগ্যতার সাথে ভূমিকা রাখছেন। যদিও এখনো বাংলাদেশের অনেক নারীই তাদের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কিন্তু সময়ের সাথে নারীর অবস্থার পরিবর্তনের এই ধারায় তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ আমরা এরকমই কয়েকজন নারী নেতৃত্বের কথা আলোচনা করবো যারা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন শেখ হাসিনা; ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তিনি একজন মহীয়সী নারী। বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের হয়ে এসে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। তিনি জনকল্যাণমুখী ও মানবতাবাদী কাজের জন্য বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এম.পি.

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এম.পি., বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ স্পিকার হিসেবে সংসদে যোগ দিয়েছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি জীবন, সর্বত্রই তিনি অত্যন্ত মেধার ছাপ রেখেছেন।

ডা. দীপু মনি এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন ডা. দীপু মনি এম.পি.। বর্তমানে তিনি দেশের প্রথম নারী শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছেন । তিনি একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, একজন চিকিৎসক এবং একজন আইনজীবী।

সমাজের বিভিন্ন পরিসরে নারীর অগ্রযাত্রা

২০১২ সালের ১৯ মে প্রথম বাংলাদেশী নারী হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন নিশাত মজুমদার।

বর্তমান বাংলাদেশের অনেক নারী ট্রেনচালক হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু প্রথম নারী ট্রেনচালক হিসেবে ২০০৪ সালে সালমা খাতুন যখন কাজ শুরু করেন। তখন অনেকের কাছেই সেটি ছিল বিস্ময়কর ঘটনা।

নারীরা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের চালিকাশক্তি হয়ে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় আশি শতাংশ এই খাত থেকে আসে।

খুশি আপা জানতে চাইলেন, তথ্যচিত্র, রিপোর্ট এবং ছবিতে আমরা কোন সময়ের ঘটনা দেখলাম? ওরা উত্তর দিল, বর্তমান সময়ের ঘটনা। মাহবুব বলল, এই সময় সব নারীর অবস্থান এবং ভূমিকা তো এ রকম না! গণেশ বলল, হয়তো সমাজের বা পরিবারের অনেক বাধা এখনও আছে। কিন্তু এই সময়ের নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগও আছে। আইন তাদের প্রায় সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে, যেমনটা একশ বছর আগে ছিল না। সরকারও তাদের অবস্থানের উন্নয়ন এবং সামাজিক ভূমিকা বাড়ানোর জন্য অনেক কাজ করছে। রনি বলল, এখন নিশাতকে ১০০ বছর আগের মত প্রবল সামাজিক বাঁধার মুখে পরতে হচ্ছে না। কলসিন্দুরের মেয়েদের শুরুতে সমাজের মানুষ সমালোচনা করলেও সাফল্য আসার পর কিন্তু সবার সমর্থন ও শ্রদ্ধা পাচ্ছে।

খুশি আপা বললেন, আমরা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা থেকে প্রায় ১০০ বছর আগেকার নারীর একটা চিত্র পেয়েছি আর এখানে আমরা বর্তমান সময়ের নারীর আরো একটা চিত্র পেলাম। চলো, দলগতভাবে এই সময়ের নারীর অবস্থান এবং ভূমিকা খুঁজে ছকে সাজিয়ে উপস্থাপন করি।

বর্তমান সময়ের নারীর সামাজিক অবস্থান	বর্তমান সময়ের নারীর সামাজিক ভূমিকা

উপস্থাপনের পর সালমা বলল, রোকেয়ার সময়ের নারীর সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা আর আজকের নারীর সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকায় কত তফাত! হাচ্চা বলল, যে নারী একসময়ে পর্দার আড়ালে থাকত আজ সে জার্সি পরে খেলছে! মামুন বলল, সেই সমাজের অবরোধ প্রথার কারণে ট্রেনের তলায় চাপা পড়েছিল নারী, আজ সে ট্রেন চালাচ্ছে! খুশি আপা বলল, চলো দলে বসে খুঁজে দেখি, এই দুই সময়ের নারীর অবস্থান ও ভূমিকায় কোথায় কোথায় তফাত হয়েছে।

প্রায় ১০০ বছর আগেকার নারী	এখনকার সময়ের নারী

ওরা দলে কাজটি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করল।

চলো, আমরাও ওদের মতো ধারাবাহিকভাবে কাজগুলো করি।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার ওপর প্রভাব ফেলে

ফ্রান্সিস ক্লাসের বন্ধুদের গল্প বলছিল, "এক দুষ্টু রাজা ছিল। তার বাগানে পাখিরা ফল খেতে আসত। রাজা হুকুম করল, সব গাছ কেটে ফেল। পিঁপড়া চিনি খেয়েছে। রাজা আদেশ দিল, সব পিঁপড়ার পেট টিপে চিনি বের করে আনো। " সবাই ফ্রান্সিসের ভঙ্গিমা দেখে আর গল্প শুনে হেসে কুটিপাটি! খুশি আপা বললেন, সত্যিকারের রাজা যদি অত্যাচারী হয়, তখন আর এমন হাসির সুযোগ হয় না। তিনি ওদের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কাহিনি বললেন।

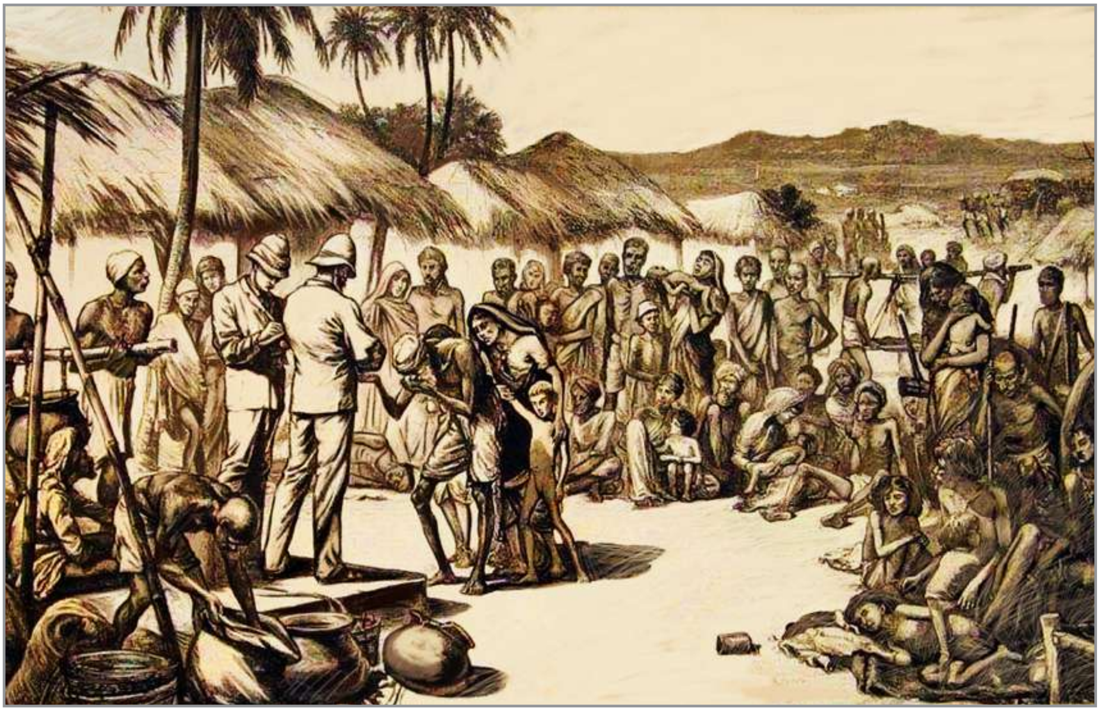

১৭৫৭ সালে পলাশীযুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করলেও নিজেরা শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়নি। তারা নিজেদের আজ্ঞাবহ নবাবকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখে। ১৭৬৫ সালে তারা দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার রাজস্ব আদায়ের অনুমতি নেয়। যার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে নবাবের হাতে আর রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে। এই অবস্থাকে বলা হয় 'দ্বৈত শাসনব্যবস্থা'।

শাসনব্যবস্থার এই বদল আরও অনেক বদল নিয়ে আসে। আগে রাজস্ব দেওয়া হতো ফসল দিয়ে, এবার তার বদলে অর্থ নেওয়া শুরু হলো। কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করার জন্য তৈরি হলো জমিদার শ্রেণি। জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে ব্রিটিশ কোম্পানির কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্য তৈরি হলো নাজিম শ্রেণি। এই তিন শ্রেণির অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে সাধারণ মানুষের ওপর করের ভার এবং অত্যাচারের মাত্রা বাড়তেই থাকল। এর ফল হলো মারাত্মক। ইংরেজি ১৭৭০ সাল, বাংলা সালের ১১৭৬, বাংলাজুড়ে শুরু হলো ইতিহাসের ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাসে তার বর্ণনা পাই। (খুশি আপা সহজ করে আনন্দমঠ থেকে ওদের বললেন) ১১৭৪ সালে ফসল ভালো হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চালের দাম বেড়ে গেল। সাধারণ মানুষের খুব কষ্ট হলো, কিন্তু রাজা কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব বুঝে নিলেন। রাজস্ব দিয়ে নি:স্ব প্রজা একবেলার বেশি খাবার পায়নি। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হলো। লোকে ভাবল দেবতা বুঝি কৃপা করলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাইল, কৃষকপত্নী আবারও গয়নার আবদার করল। কিন্তু আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হলেন। আশ্বিন-কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়ল না। ধানক্ষেত শুকিয়ে খড় হয়ে গেল। অল্পবিস্তর যা ধান হয়েছিল তা রাজপুরুষরা সিপাহিদের জন্য কিনে রাখল। লোকে আর খেতে পেল না। প্রথমে একবেলা আধপেটা খাবার জুটত তারপর তিনবেলাই উপবাস। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের কর্তা একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়িয়ে দিল। বাংলায় কান্নার রোল পড়ে গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করতে শুরু করল। তারপরে কে ভিক্ষা দেয়! শুরু হলো উপবাসের পালা। লোকে বীজধান খেয়ে ফেলল। গরু, লাঙল, জোয়াল, ঘরবাড়ি, জমি সব বিক্রি হতে লাগল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী— সবই বেচতে শুরু করল। একসময়ে আর কেনার লোক নেই, সবাই কেবল বেচতে চায়। মানুষ গাছের পাতা-ঘাস-আগাছা খেতে লাগল, এমনকি কুকুর-ইঁদুর-বিড়ালও খাদ্য হলো। শুরু হলো মহামারি রোগ বসন্ত । কেউ কাউকে দেখার নেই, চিকিৎসা করার কেউ নেই। বাড়িতে একবার বসন্ত ঢুকলে রোগী ফেলে বাড়ির লোকেরা পালিয়ে যায়। ঘরে ঘরে পচতে থাকে মৃতদেহ।

এই দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ অনাহারে, রোগে-শোকে মরে গিয়েছিল। তবু রাজস্ব আদায় আগের চেয়ে বেশি হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, ব্রিটিশ কোম্পানি সাধারণ মানুষের ওপর কী পরিমাণ অত্যাচার চালিয়েছিল! সে সময় কৃষক, কারিগরদের অনেকে বেকার হয়ে যায়। ঢাকার মসলিন শিল্পের অনেক কারিগর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। অনেক মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়। ফলে শহরের ওপর চাপ বেড়ে যায়। বহু অঞ্চল জনশূন্য হয়ে জঙ্গলে পরিণত হয়। বাংলার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। খাবার আর অর্থের অভাবে মানুষ চুরি-ডাকাতি-লুটপাট শুরু করে। বাংলার সব জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। সাধারণ মানুষও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সেই সময় চলতে থাকা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ ব্যাপকভাবে সহযোগিতা ও সমর্থন দেয়।

গণেশ জানতে চাইল, কেমন করে এই অবস্থার বদল ঘটল? খুশি আপা বললেন, তাহলে একটু গোঁড়া থেকেই শোনো, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তো ভারতবর্ষের শাসক হয়ে ওঠে, কিন্তু এই কোম্পানি ছিল কেবল একটি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান। শাসন কাজের অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। শুরুতে তাদের এদেশের ভাষা, দেশীয় রীতি-নীতি বুঝতে অসুবিধা হতো। এখানকার সমাজব্যবস্থা তো ব্রিটেনের মতো নয়। তাই ব্রিটিশ আইন-কানুন, ব্রিটিশ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশটাকে চালানো সম্ভব ছিল না। আর সেই সময় বাংলা সম্পদশালী। তাই বাংলা থেকে পাওয়া রাজস্বই ছিল কোম্পানির ব্যবসার সবচেয়ে বড় মূলধন। শুরুতে দেশ শাসনের সুবিধার জন্য কোম্পানি একজন নওয়াব নিযুক্ত করে। নওয়াব দেশের নিজস্ব আইন-কানুন, রীতি-নীতির মাধ্যমে দেশ শাসন করবে আর একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নওয়াবের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করবে। তাতে তাদের দেশ শাসনের ঝামেলায়ও যেতে হয় না আবার টাকা-পয়সারও অভাব হয় না। এই ব্যবস্থাই ‘দ্বৈত শাসন’।

কিন্তু ধীরে ধীরে নওয়াবের সঙ্গে কোম্পানির লোকদের বিরোধ শুরু হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে লুটপাট-অত্যাচার শুরু করে। এই সময় আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। লোকের অভাবে বাংলার তিন ভাগের দুইভাগ চাষের জমি বন-জঙ্গল হয়ে ওঠে। এরপর শাসনক্ষমতা পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় কোম্পানি। অবসান হয় দ্বৈত শাসনের। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বড় বদল আসে। এরপর কৃষকদের পাঁচ বছর মেয়াদে সরাসরি জমি ইজারা দেওয়া হয়। তাদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্রিটিশ কালেক্টর নিযুক্ত হয়। কিন্তু এই পাঁচসালা বন্দোবস্তও বেশিদিন টেকেনি। উচ্চ হারে রাজস্ব দিতে না পেরে অনেক কৃষক পালিয়ে যায়, অনেকে হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে।

এরপর ১৭৭৭ সালে শাসনব্যবস্থায় ফিরে আসে জমিদারি প্রথা, যা ব্রিটিশ শাসনের আগে থেকেই এখানে চালু ছিল। প্রশাসনেও আসে অনক নতুন ব্যবস্থা। শুরুতে জমিদারি ব্যবস্থা বছর অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক থাকলেও ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ঘোষণা দেয়, এরপরে এই চুক্তি হবে নিয়মিত খাজনা পরিশোধ সাপেক্ষে চিরস্থায়ী। অর্থাৎ যত দিন জমিদাররা নির্ধারিত হারে, সময়মতো রাজস্ব দিতে পারবে তত দিন বংশানুক্রমে তারা জমিদারি ভোগ করবে। এটিই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হিসেবে পরিচিত। কিন্তু জমিদাররাও এই ব্যবস্থায় খুশি ছিল না। কারণ একদিকে রাজস্বের উচ্চ হার অন্যদিকে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসলহানি, প্রাণহানি— যা-ই ঘটুক না কেন, এই ব্যবস্থায় খাজনা মওকুফের কোনো বিধান ছিল না। ফলে যে কোনো জমিদারি যেকোনো সময় নিলাম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে গেল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণি তৈরি হয়— ছোট-বড় নতুন জমিদার, তালুকদার, জোতদার, নব্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি। এসময়েও জমিদারদের অসন্তোষ-বিক্ষোভ, মামলা নিষ্পত্তিতে বিচার বিভাগের ব্যর্থতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি— সবকিছু মিলে পরিস্থিতি বিশেষ ভালো হয়নি। ১৭৯৯ সালে জমিদারদের সন্তুষ্ট করতে কর আদায়ের জন্য প্রজাদের ওপর অত্যাচারের সীমাহীন স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এর ফলে জমিদাররা ইচ্ছামতন কর আরোপ, বিচারের নামে নির্যাতন, সম্পদ-গবাদি পশু ক্রোক করা, এমনকি কোনো কৃষক কর না দিয়ে পালিয়ে গেলে তার গ্রামের সবাইকে জরিমানা করার মতো অন্যায়-অত্যাচার শুরু করে। এ সময় জমিদার ও প্রজাদের মাঝখানে অনেক মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হয়।

ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে এদেশীয় জমিদারদের দূরত্ব কমে আসে। এর ফলে ভারতবর্ষের সিপাহি বিদ্রোহ, স্বদেশি আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় জমিদারদের সমর্থন ছিল ব্রিটিশদের পক্ষে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পেছনে ব্রিটিশ শাসকদের কিছু ইতিবাচক উদ্দেশ্যও ছিল। তারা ভেবেছিল, জমির ওপর জমিদারদের চিরস্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে জমিদার শ্রেণি নিজেদের স্বার্থেই কৃষিখাত, শিল্পখাত, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়নে মনোযোগী হবে। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। জমিদাররা কৃষিখাতে বিনিয়োগকে লাভজনক বলে মনে করেনি। তার চেয়ে খাদ্যশষ্যের ব্যবসা, জমি কেনা, বিলাসিতায় ব্যয় করাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

জমিদার শ্রেণি আবার আর একটি শ্রেণিকে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে জমিদারি ব্যবস্থাপনা আর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়ে দেয়। সেই শ্রেণি দেয় আবার আরেক শ্রেণিকে। সেই শ্রেণি আবার আরেক... এমনি করে স্তরে স্তরে অর্থ আদায় চলতে থাকে। তাদের সবার স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে প্রজাদের জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। জমিদার থেকে প্রজার মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের পনেরোটি স্তরও পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক

শ্রেণির পিরামিডে সবার ওপরে জমিদার আর সবথেকে নিচে কৃষক, এর মাঝখানে আরও অনেকগুলো স্তর। এর মধ্যে প্রজাদের কাছ থেকে যারা কর আদায় করত তারা ছাড়া আর কারোর কোনো কাজ ছিল না। তারা কেবল চাষির ফসল আর অন্যান্য উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল একটা পরজীবী শ্রেণি হয়েই টিকে ছিল। অর্থাৎ উৎপাদনের কাজ করত চাষি আর এর ওপরের স্তরের সবাই তার কাছ থেকে শুষে নিত। এ যাবৎকালে বাংলায় কৃষক, তাঁতি, কারিগর শ্রেণির উচ্চ অবস্থান ছিল, ব্রিটিশরা ক্ষমতায় আসার পরে জমিদার, মহাজন, বেনিয়ারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হলো। প্রজাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠার ফল সেই সময়ের নানান কৃষক বিদ্রোহ। দক্ষিণ বাংলার একটি এলাকার কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা শোনো—

১৭৯২ সালে জমিদারদের আরোপিত অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে ঝালকাঠির সুগন্ধিয়া গ্রামের কৃষকরা বিদ্রোহী ভূমিকা নেয়। তারা কর দিতে অস্বীকার করে। তাদের নেতা ছিল 'বোলাকি শাহ্'। এই বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করতে ব্রিটিশ সরকার সৈন্য পাঠায়। সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত কৃষক নেতা বোলাকি শাহকে জেলে পাঠানো হয়। তার দলের বিদ্রোহী কৃষক ইদির, খিদির, ইসাফ— তিন ভাই পিরোজপুর মহকুমার উদয়তাড়া বুড়ির চর গ্রামে পালিয়ে আসেন। এরপর তুষখালী গ্রামকে কেন্দ্র করে আশপাশের গ্রামের কৃষকদের নিয়ে আবার নতুন করে আন্দোলন শুরু করেন। তাদের নেতৃত্বে সেখানকার কৃষকরাও জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাদের স্লোগান ছিল, "ফিরিঙ্গিদের জমি না/খাজনাও তাই দিমু না। " আশপাশের তেইশটি গ্রামের মানুষ প্রতিবছর চৈত্র মাসে, খাজনা দেওয়ার সময় তুষখালি গ্রামে মিলিত হয়ে স্লোগান দিত, প্রতিবাদ করত। এখানে জমিদারদের সঙ্গে বিদ্রোহী কৃষকদের বারবার সংঘর্ষ হয়েছে। বহুবার জমিদারি হাতবদল করেও বিদ্রোহীদের দমানো যায়নি। ১৮৪০ সালে রাজস্ব আগের চেয়েও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইদির, খিদির, ইসাফ ভাইদের নেতৃত্বে এরপর প্রায় বিশ বছর জমিদার-কৃষক খণ্ড খণ্ড লড়াই চলে। তিন ভাইয়ের মৃত্যুর পর ইদিরের ছেলে ইব্রাহিম এই কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্বে আসেন। জমিদারদের অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হার না মানা এই কৃষকদের গ্রামগুলোকে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ১৮৭১ সালে সরকারী খাস জমি হিসেবে ঘোষণা করে। এই কৃষকরা তখন নানান স্তরের মধ্যস্বত্বভোগীদের পর্ব পেরিয়ে সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দিতে শুরু করে।

এ রকম কৃষক আন্দোলন চলেছে মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, সন্দীপ, মেহেন্দীগঞ্জ, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ আরও নানা জায়গায়। উনিশ শতকের আশির দশকে কৃষক বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। রাজস্ব আদায় এবং বিদ্রোহী কৃষকদের দমনের জন্য জেলা, মহকুমা, থানা স্থাপিত হয়। পুলিশ, কোর্ট, জেলখানা ইত্যাদি ব্যবস্থা আসে।

এসব বিদ্রোহ আর প্রতিরোধ আন্দোলনের কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। মালিক জমিদার শ্রেণি প্রজাদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে আর প্রজারা নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার হতে শুরু করে। জমিদারদের জমিদারি বংশ পরম্পরায় বংশধররা পেত। ফলে জমিদারি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হতে শুরু করে। পারিবারিক কলহ-বিবাদ, জমিদারিতে অনুপস্থিতি, ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদি নানা কারণে জমিদার শ্রেণির অবক্ষয় শুরু হয়। ফলে প্রায় ১০০ বছর আগে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, জোতদার, হাওলাদার, বিত্তবান কৃষক ইত্যাদি শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ কোম্পানির দেশ শাসনের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়। ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হতে চলে যায়। ১৮৮৫ সালে আসে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন'। এই আইনে একদিকে জমিদারদের ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ছাঁটাই হয়। অন্যদিকে প্রজাদের দাবি-দাওয়া

অনেকাংশে মেনে নিয়ে প্রজাদের এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার ও দায়দায়িত্বের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়। কিন্তু সকল শ্রেণির কৃষকদের অধিকারের কথা বলা হয়নি।

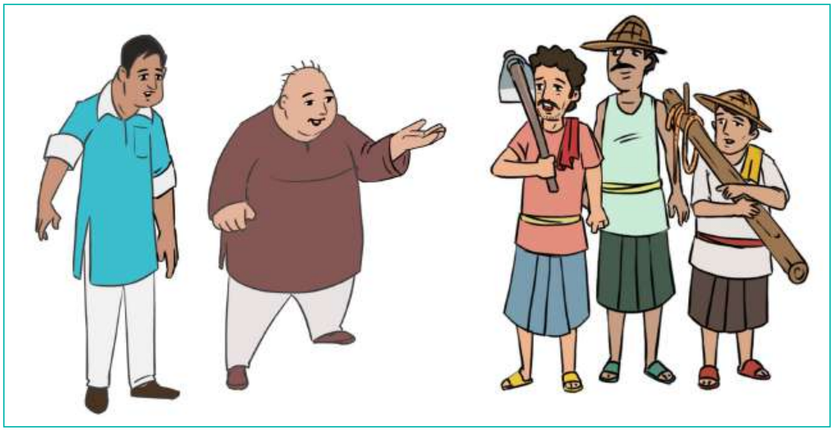

১৯২০ সাল, এবার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মোড় নিয়ে আসে গণতান্ত্রিক নির্বাচনব্যবস্থা। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য জনসংযোগের প্রয়োজন হয়। তাই এ সময় বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ সংগঠনে কৃষক শাখা প্রতিষ্ঠিত করে। কৃষকরা সংগ্রামী কর্মীদের সংস্পর্শে সক্রিয় ও অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। এতকাল নিজের জমিতে গাছ কাটা, পুকুর কাটা, জমি বিক্রি বা বন্ধক দিতে হলে জমিদারকে সালামি দিতে হতো। নির্বাচনের রাজনীতির প্রবর্তন হলে বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ঘটে। তখন অধ:স্তন কৃষকদের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে জনমত সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। বাংলার কৃষকদের অধিকাংশই ছিল ভূমিতে অধিকারবিহীন। আইনসভায় বর্গাদারদেরও জমিতে অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন হলো ১৯২৮ সালে কিন্তু তাতেও বর্গাচাষিদের বিশেষ সুবিধা হলো না। তবে নতুন ব্যবস্থায় কেবল জমি হস্তান্তরে জমিদারকে সালামি দিতে হতো। জমিসংক্রান্ত অন্যান্য কাজে জমিদারের অনুমতির প্রথা বাতিল হলো। ১৯৩৫ সালে আসে কৃষক-প্রজা পার্টি। এই দলের নেতা এ কে ফজলুল হক বলেন, ক্ষমতায় গেলে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেব। ১৯৩৮ সালে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা এই আইনের আবার সংশোধনী আনে। সালামি ব্যবস্থা এবং

জমিদারের ক্রয়ের অগ্রাধিকার বন্ধ হয়। প্রজারা এবার জমির সত্যিকারের মালিক হয়। বর্গাচাষিদেরও কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে হয় উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলন। এর প্রতিক্রিয়ায় সে সময়ের বাংলা সরকারের প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালে জমিদারি বিলোপ ও প্রজাস্বত্ব এবং বর্গাচাষীদের অধিকারের জন্য আইনসভায় দুটো বিল আনেন। কিন্তু দেশ বিভাগের কারণে দুটি বিল আর আইনে পরিণত করা যায়নি। এরপর ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন আসে, যার অধীনে জমিদারি প্রথা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চিরস্থায়ী অবসান ঘটে। প্রজারা এবার জমির মালিক হিসেবে অভিহিত হয়। তারা সরাসরি সরকারকে খাজনা দিতে শুরু করে।

কাহিনি শেষে খুশি আপা জানতে চাইলেন, সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদলের কোনো ঘটনা কি এখানে দেখতে পাচ্ছ? ওরা 'হ্যাঁ' বলল। নীলা বলল, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সমাজের গতিবিধি ঠিক করে দিচ্ছে। এখানে শাসন ব্যবস্থার বদলের কারণে সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল হয়েছে। সেইসঙ্গে বদল হয়েছে ব্যক্তির ভূমিকা ও অবস্থান। খুশি আপা বললেন, তার মানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদলের কারণে সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল হয়েছে। চলো, আমরা দলে বসে খুঁজে দেখি এখানে কী কী ঘটেছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদল	ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার বদল	সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল

কাজ শেষে উপস্থাপনের পর ওরা বুঝল, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদলও ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার বদল ঘটায়। তাতে সামাজিক প্রেক্ষাপটও প্রভাবিত হয়।

আমরাও ওদের মতো দলে বসে খুঁজে দেখি এবং প্রাপ্ত ফলাফল ক্লাসে উপস্থাপন করি।

হারুন: আমরা নিজেদের এলাকার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল এবং সেখানে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে অনুসন্ধানী কাজ করি চলো।

অন্বেষা: যতটা সম্ভব বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করলে বেশি ভালো হবে।

ওরা দল তৈরি করে আলোচনার ভিত্তিতে গবেষণার জন্য তথ্যছক তৈরি করল।

আমার এলাকার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন; ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা			
নাম:			ঠিকানা:
বয়স:			
সময়কাল	রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	সামাজিক প্রেক্ষাপট	আমার অবস্থান ও ভূমিকা

কাজ শেষে ওরা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করল। কেউ পোস্টার বানিয়েয়েছে কিংবা মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট বানিয়েছে। কেউ প্রতিবেদন লিখেছে, কেউবা আবার কমিক তৈরি করেছে। কেউ টাইমস্কেল তৈরি করেছে। একটা দল ছোট্ট একটা ভিডিও বানিয়েছে।

এসো, আমরাও ওদের মতো 'আমার এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন; ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা' শিরোনামে অনুসন্ধানী কাজ করি।

উপস্থাপন শেষে দেখা গেল, গত ৬০-৭০ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি (ঘরবাড়ি, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, শিল্পরুচি, অবসরযাপন), নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক বদল এসেছে। নানা ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকায়ও এসেছে অনেক পরিবর্তন।

সেই সঙ্গে ওরা লক্ষ করল, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কেবল ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকায় প্রভাব ফেলে তা নয়; ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকাও সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রভাব ফেলে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এর উদাহরণ। দেশে দেশে নানা সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন; ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা

খুশি আপা বললেন, নিজের এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদল এবং সেখানে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে অসাধারণ কাজ হয়েছে! এবার আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিষয়েও অনুসন্ধানী কাজ করতে পারি। গৌতম বলল, হ্যাঁ, আপা । ব্যক্তি নিজের অবস্থান থেকেও যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে ভূমিকা রেখেছে, তেমনি আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদলও ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা বদলে দিয়েছে। রনি বলল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পারস্পরিক প্রভাব নিয়ে আমরা অনুসন্ধানী কাজ করতে পারি।

ওরা আলোচনার ভিত্তিতে অনুসন্ধানী কাজের জন্য কিছু বিষয় নির্ধারণ করল। বই-পত্রপত্রিকা-ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কাজটি সম্পন্ন করল। বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ওদের কাজের ফলাফল উপস্থাপন করল।

আমরাও নিজেদের মতো করে বিষয় নির্বাচন করে বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদল এবং ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধানী কাজ করি।

টেকসই উন্নয়ন ও আমাদের ভূমিকা

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব

আজ মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। রনি, মিলি ও ক্লাসের অনেক বন্ধু স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মজা করে কাগজের তৈরি নৌকা বানিয়ে বৃষ্টির পানিতে ভাসাচ্ছে।

খুশি আপা সেটি দেখে ওদের সাথে নৌকা ভাসানোর খেলায় যোগ দিলেন।

নৌকা ভাসানো শেষে ওরা সবাই ক্লাসে ফিরে এলো। খুশি আপা সবাইকে বৃষ্টিভেজা দিনের শুভেচ্ছা জানালেন।

আনোয়ার বলল আপা আজ খুব মজা হলো, অনেকদিন পর বৃষ্টির পানিতে নৌকা ভাসালাম।

খুশি আপা বললেন, আমারও খুব মজা লেগেছে, ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। একবার ভেবে দেখোতো প্রকৃতি কত রুপেই না আমাদের মন ভালো করে চলেছে অবিরাম!

শিহান বলল হ্যাঁ আপা আর আমাদের সব কাজেই আমরা প্রকৃতির থেকে পাওয়া সম্পদকে ব্যবহার করে চলেছি।

রনি বলল, হ্যাঁ ঠিক বলেছ শিহান, যেমন আজ নৌকা ভাসানোতে বৃষ্টির পানিকে ব্যবহার করেছি।

আনুচিং মগিনী বলল শুধু কি তাই! কাগজ ব্যবহার করেছি সেটাও তো গাছ থেকে তৈরি হয়। সেটাও প্রকৃতি থেকেই তো এসেছে।

খুশি আপা বললেন, চলো আমরা এখন কিছু সম্পদের ছবি দেখি।

পানি

জ্বালানী (কয়লা)

বায়ু

আবাসস্থল

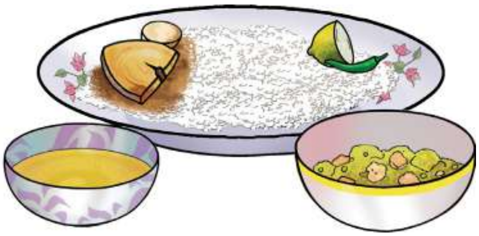

খাদ্য

ছবিতে আমরা যে যে জিনিজগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো সম্পর্কে আমরা কী কী জানি?

মিলি বলল, আপা, এখানে যে যে জিনিসের ছবি দেওয়া হয়েছে এগুলো সবই আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে লাগে।

শিহান বলল আর এসব জিনিস আমরা প্রকৃতি থেকেই পাচ্ছি। তাই এগুলো সবই প্রাকৃতিক সম্পদ।

প্রাচীন ও বর্তমান মানুষের সম্পদের ব্যবহার অনুসন্ধান

সময়ের সাথে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিবর্তন অনুসন্ধান

সালমা বলল আচ্ছা আপা, এসব সম্পদের ব্যবহার তো মানবসভ্যতার শুরু থেকেই হয়ে আসছে তাই না! তখনও কি মানুষ আমাদের মতো করেই প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছে?

খুশি আপা বললেন, খুব ভালো প্রশ্ন সালমা, চলো তাহলে আমরা খুঁজে বের করি প্রাচীন সভ্যতার মানুষ কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করেছে।

মিলি বলল, আপা এই অনুসন্ধান কাজে তো আমরা আমাদের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের অনুসন্ধানী পাঠ এর সাহায্য নিতে পারব তাই না?

রনি বলল, এছাড়া ইন্টারনেটের সাহায্যও নিতে পারি।

খুশি আপা বললেন, নিশ্চয়।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দল একটি করে সভ্যতা বেছে নিলো এবং সেই সভ্যতার মানুষ কী কী এবং কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ কে ব্যবহার করেছে সেটি অনুসন্ধান করে বের করল।

কাজটি শেষ হলে রনি বলল, আপা আমরা যা অনুসন্ধান করে পেয়েছি তা যদি মানচিত্রে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে উপস্থাপন করি তাহলে কেমন হবে?

মিলি বলল, হ্যাঁ আমরা তো জানি পৃথিবীতে কোথায় কোন সভ্যতা ছিল।

খুশি আপা বললেন, এতো খুবই ভালো প্রস্তাব।

তখন ওরা ওদের প্রাপ্ত তথ্য হতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে ভিন্ন ভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে বিশ্ব মানচিত্রে উপস্থাপন করল।

চলো আমরাও ওদের মতো করে প্রাচীন সভ্যতার মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার খুঁজে বের করি এবং ওপরের মানচিত্রে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে তা উপস্থাপন করি।

আমাদের জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

কাজটি শেষ হলে খুশি আপা বললেন, আমরা তো দেখলাম প্রাচীন মানুষরা তাদের প্রয়োজনে কীভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছে। আমরাও তো প্রতিনিয়ত আমাদের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে চলেছি তাই না?

রনি বলল, হ্যাঁ আপা কিন্তু কতটুকু ব্যবহার করছি তা বুঝতে পারছি না।

তখন খুশি আপা বললেন, বেশ তাহলে চলো এটা বের করার জন্য আমরা একটা মজার কাজ করি।

আমরা আমাদের প্রতিদিন কে ৩টি ভাগে ভাগ করি। যেখানে সকাল দুপুর ও রাত এ আমরা আমাদের প্রয়োজনে কীভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করছি তা লিখে ফেলি।

মামুন বলল যেমন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা পানি খাই, পানি তো একটি প্রাকৃতিক সম্পদ তাই না!

রনি বলল, শুধু কি তাই আমরা রাতে ঘুমাতে যায় যে খাটে সেটাও তৈরি হয়েছে প্রকৃকির সম্পদ গাছ ব্যবহার করে অথবা লোহা কে ব্যবহার করে তাই না!

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক ধরেছ তোমরা। চলো তাহলে কাজটি করে ফেলি।

সময়	প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার
সকাল	
দুপুর	
রাত	

সময়ের সাথে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিবর্তন ও পরিবেশ

কাজটি শেষ হওয়ার পর সুমন বলল, আপা সেই মানব সভ্যতা শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে চলেছি।

রনি বলল, পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, সেই সাথে তো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাত্রা ও বাড়ছে তাই না!

মিলি বলল, আর এটার প্রভাব আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ও তো পড়ছে তাই না!

খুশি আপা বললেন, তাহলে চলো সময়ের সাথে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের যে পরিবর্তন তা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর কী কী প্রভাব ফেলছে তা দলে আলোচনা করে খুঁজে বের করি।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে মানুষের সম্পদের ব্যবহারের মাত্রার সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করে খুঁজে বের করল এবং ক্লাসে সবার সামনে তা উপস্থাপন করল।

চলো আমরাও দলে ভাগ হয়ে সময়ের সাথে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ধরন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর তার প্রভাব খুঁজে বের করি।

সামাজিক জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তনের প্রভাব

অনুসন্ধানের কাজ শেষে মিলি বলল, আপা দিন দিন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার যে হারে বাড়ছে তাতে এসব

সম্পদ কি এক দিন শেষ হয়ে যাবে না?

খুশি আপা বললেন, তা তো যেতেই পারে।

আনুচিং বলল কিন্তু আপা আমরা যদি কোনো সম্পদ যে পরিমান ব্যবহার করব ঠিক সেই পরিমান আবার পূরণ করতে পারি তাহলে তো আর শেষ হওয়ার সম্ভবনা নেই! তাই না?

খুশি আপা বললেন, ঠিকই বলেছ আনুচিং, কিন্তু কিছু সম্পদ আছে যা একবার ব্যবহার করে ফেললে তা পূরণ হতে কয়েক মিলিয়ন বছর লেগে যায়। যেমন- জীবাশ্ম জ্বালানী।

ভূপৃষ্ঠের সুপেয় পানি সম্পদ

পৃথিবী ও বাংলাদেশে সুপেয় পানির অবস্থা

সালমা বলল আপা আমাদের বেঁচে থাকতে যেসব উপাদান লাগে সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে পানি। পৃথিবীতে তো অনেক পানি, তাহলে তো আমরা পানির সমস্যায় কখনও পড়বো না তাই!

মিলি বলল, হ্যাঁ পানি আছে তবে সুপেয় পানি খুব বেশি নেই।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ তোমরা। চলো এখন আমরা একটা মজার কাজ করি। প্রথমে আমরা একটি পৃথিবীর মানচিত্র দেখে পৃথিবীর মহাদেশগুলোর মধ্যে কোন কোন দেশে সুপেয় পানির প্রাচুর্য্য আছে এবং কোথায় কোথায় স্বল্পতা আছে তা খুঁজে বের করব এবং পরে নিচের ছকে গ্লোবের সাহায্যে মহাদেশ অনুযায়ী দেশগুলোর নাম লিখে ছকটি পূরণ করব।

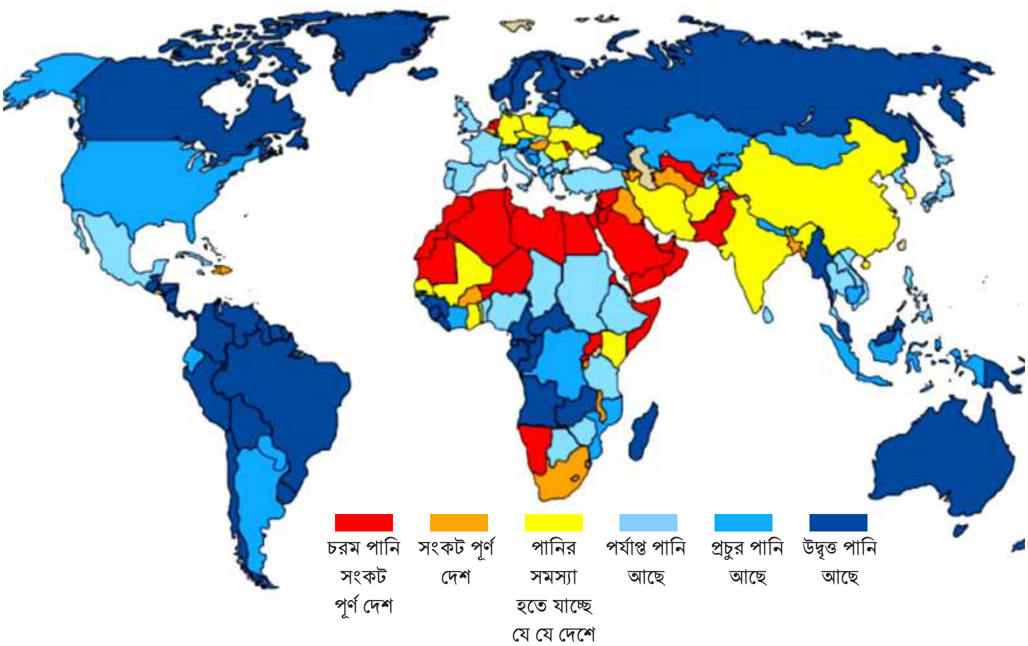

চরম পানি সংকট পূর্ণ দেশ	সংকট পূর্ণ দেশ	পানির সমস্যা হতে যাচ্ছে যে যে দেশে	পর্যাপ্ত পানি আছে	প্রচুর পানি আছে	উদ্বৃত্ত পানি আছে

চলো ওদের মতো করে আমরা ছকটি পূরণ করে ফেলি।

ব-দ্বীপের গড়ে ওঠা

কাজটি শেষ করার পর শিহান বলল কি সর্বনাশ, বাংলাদেশে তো পানিসম্পদের অবস্থা খুবই খারাপ দিকে চলেছে।

খুশি আপা বললেন, ঠিকই বলেছ শিহান। আমরা সতিই খুব বিপদের মাঝেই আছি।

মিলি বলল, কিন্তু আপা আমাদের দেশ তো নদীমাতৃক দেশ। তাহলে আমরা কেন পানির অভাবে আছি?

আনুচিং বলল আপা আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছিলাম বাংলাদেশ একটি বদ্বীপ যা গঠিত হয় নদীর দ্বারা, তাহলে তো আমাদের পানির প্রাচুর্য থাকার কথা ছিল কিন্তু তা না হয়ে সংকটপূর্ণ হয়ে গেল কেন?

খুশি আপা বললেন, তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের আগে জানতে হবে কীভাবে বদ্বীপ গঠিত হয়! চলো আমরা কিছু কাজের মাধ্যমে দেখে নিই কীভাবে বদ্বীপ গড়ে ওঠে এবং বাংলাদেশ নামক বদ্বীপ কী কী সমস্যায় পড়তে চলেছে।

প্রথমে আমরা একটি পরীক্ষণ এর মাধ্যমে বদ্বীপ কীভাবে গড়ে ওঠে সেটা দেখব।

উপকরণ

বালি, পানি, টেবিল/অ্যালুমিনিয়াম ট্রে

পদ্ধতি

একটি টেবিলে/অ্যালুমিনিয়াম ট্রে তে বালুর স্তূপ তৈরি করব এবং পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেব যেন বালুর দানাগুলি একসাথে লেগে থাকে। বালুর স্তরটি কোথাও উঁচু এবং কোথাও সমতলভাবে তৈরি করব। (এখানে বালি পলি মাটিকে নির্দেশ করে।)

এখন বালুর স্তূপের উপর থেকে পানি ঢালবো এমনভাবে যেন পানি টেবিলের/অ্যালুমিনিয়াম ট্রে ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

এখন স্তূপ থেকে পলি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া এবং স্তূপের সমতল প্রান্ত বরাবর পানি দ্বারা পলির পরিবহন লক্ষ্য করব।

একইভাবে পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করব। কম পানি ঢেলে এবং বেশি পানি ঢেলে পরীক্ষা করতে থাকব এবং লক্ষ রাখব কীভাবে বালুর তৈরি ভূমিরূপটির পরিবর্তন হয়।

ট্রের পানি পড়ার শুরুর স্থান ও শেষ স্থানের বালুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করব।

এরপর বালুর সাথে কিছু নুড়িপাথর যুক্ত করে পানির প্রবাহ দিয়ে দেখব কী কী পরিবর্তন হয়।

এরপর পরীক্ষণের ফলাফল আমরা নিচের ছকে ছবি এঁকে পূরণ করব।

চলো ওদের মতো করে আমাদের বদ্বীপ তৈরি প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ টি করে ফেলি।

তথ্য এবং পর্যবেক্ষণ

পানির প্রবাহ হার	পরীক্ষণ ট্রের অবস্থার চিত্র
বালুতে কম পানির প্রবাহ	
বালুতে বেশি পানির প্রবাহ	
নুড়ি যুক্ত বালুতে পানির প্রবাহ	

মিলি বলল, এখন বুঝতে পারলাম আপা এভাবে নদীর দ্বারা পলি এসে জমে জমেই বাংলাদেশ নামক বদ্বীপের জন্ম হয়েছে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই মিলি। তবে এটা তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া কিন্তু অনেক দিন ধরেই চলতে থাকে। চলো এখন আমরা আমাদের বাংলাদেশ নামক বদ্বীপের একটি মানচিত্র দেখে এই বদ্বীপে প্রবেশ করা নদীগুলো খুঁজে বের করি এবং এই নদীগুলো কোন কোন দেশের মধ্য দিয়ে এসেছে তা খুঁজে বের করে লিখে ফেলি।

নদীর নাম	যে যে দেশ হয়ে বাংলাদেশে এসেছে

সবার কাজ শেষ হলে খুশি আপা সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, তোমরা সবাই খুব সুন্দর করে বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে আসা নদীগুলো খুঁজে বের করেছ।

শিহান বলল আপা আমার ভাবতেই অবাক লাগছে একই নদীর পানি কিন্তু আমরা কতগুলো দেশের মানুষ সেটা ব্যবহার করছি।

খুশি আপা বললেন, ঠিক শিহান এখন ভাবো তো যদি এই নদীগুলোর ওপর বাঁধ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কেমন হবে?

শফিক বলল আপা তাহলে তো আমাদের অনেক রকম সমস্যা হতে পারে। কারণ আমাদের দেশের অবস্থান বদ্বীপের নিচের দিকে আর উজান বা ওপরের দিকে যদি বাঁধ দেওয়া হয়, তাহলে তো আমাদের দেশের নদীগুলো ঠিকমতো পানি পাবে না।

মিলি বলল, কিন্তু রনি কর্ণফুলি নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে তো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও তৈরি করা হয়েছে এবং জন্ম হয়েছে কাপ্তাই হ্রদের।

খুশি আপা বললেন, তোমাদের দুজনেরই কথা সঠিক। তাহলে চলো আমরা বাঁধ নিয়ে একটা অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করি।

জেনে রাখ

বাঁধ বলতে এমন একটি প্রতিবন্ধক দেওয়ালকে বোঝানো হয় যেটি জলের প্রবাহকে বাধা দান করে। এটি মূলত কোন স্থানে কৃত্রিম উপায়ে পানি ধরে রেখে এর নিকট বা দূরবর্তী এলাকায় সেচ বা পানীয় জলের কৃত্রিম উৎস এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে ব্যবহার করা হয়।

জামাল বলল খুব ভালো হবে। তাহলে আমরা সবাই বুঝতে পারব বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর বা আশপাশের মানুষের জীবনে এটি কী ধরনের প্রভাব ফেলছে।

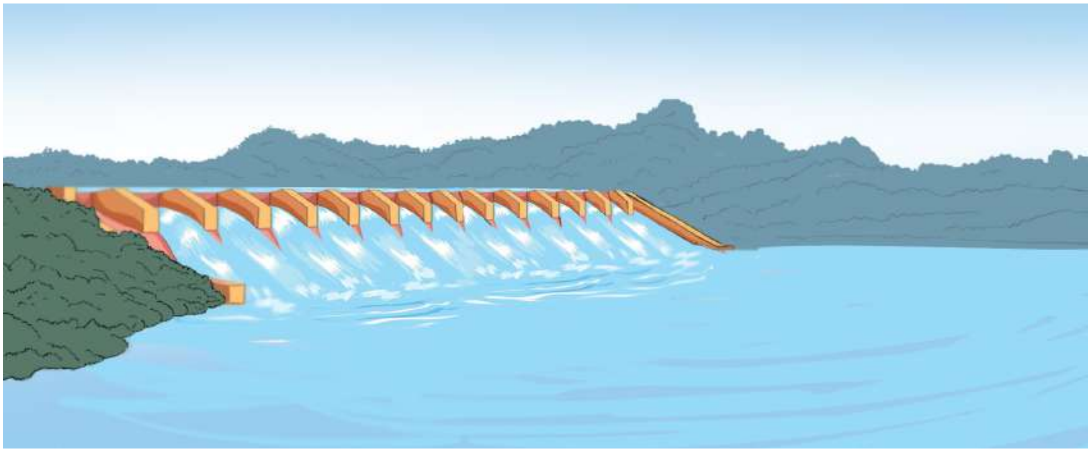

বাঁধ

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ জামাল।

মিলি বলল, আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে অনুসন্ধানমূলক কাজ করেছি। তাহলে আমাদের সবার প্রথমে সমস্যা/প্রশ্ন তৈরি করতে হবে, যার সমাধান বা উত্তর আমরা খুঁজতে চাই। খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ মিলি। চলো তাহলে আমরা অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে আমাদের অনুসন্ধানের কাজ শুরু করি।

চলো আমরাও বন্ধুরা মিলে জলবিদ্যুৎ বাঁধ এবং প্রকল্পগুলো কীভাবে ব-দ্বীপকে প্রভাবিত করতে পারে সেই সম্পর্কিত একটি অনুসন্ধানমূলক কাজ করি। কাজটি করার জন্যে আমরা আমাদের কাছাকাছি কোনো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা (যদি থাকে) অথবা কোনো বাঁধ এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করব। প্রশ্ন তৈরি করে এলাকার মানুষের সাথে কথা বলব এবং প্রকল্প/বাঁধের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব অনুসন্ধান করব।

এরপর ওরা সবাই যা জানতে চায় সেই বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি করে খুশি আপার সহযোগিতায় এলাকার কাছাকাছি একটি বাঁধ দেওয়া জায়গা পরিদর্শন করল এবং বাঁধের প্রভাব নিয়ে এলাকার বয়স্ক মানুষের সাথে কথা বলল। এরপর আরো কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য তারা ইন্টারনেট ও বিভিন্ন বাঁধ নিয়ে লেখা কিছু বই পড়ে সংগ্রহ করল এবং সবশেষে তথ্য বিশ্লেষন করে ফলাফল তৈরি করল।

অনুসন্ধান কাজের শেষে রনি বলল, আপা আমরা যদি আমাদের অনুসন্ধানের ফলাফল একটি বিতর্ক আকারে উপস্থাপন করি তাহলে কেমন হবে?

খুশি আপা বললেন, এতো খুবই ভালো প্রস্তাব। তাহলে চলো একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করি।

মিলি বলল, কিন্তু বিতর্কের তো একটি বিষয় থাকে এবং কিছু নিয়মও থাকে। আর নিয়ম ছাড়া তো কোনো কিছুই ভালোভাবে করা যায় না।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ মিলি চলো তাহলে প্রথমে আমরা আমাদের বিতর্ক প্রতিযোগিতার কিছু নিয়ম ঠিক করে নিই।

বাঁধ বিতর্ক

নিয়মাবলি

- প্রথমে আমরা ৫-৬ জনের ৬টি দল গঠন করে ৩ ধাপে বিতর্ক আয়োজন করব। প্রথম ধাপে ২ দল এভাবে পর্যায়ক্রমে ৬টি দল বিতর্কে অংশ নেবে।
- আমরা আমাদের অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং ফারাক্কা বাঁধ, টিপাইমুখ বাঁধ, তিস্তা বাঁধ ও কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এর জন্য কিছু তথ্য ইন্টারনেট/বইয়ের সাহায্যে সংগ্রহ করে একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করব
- এরপর বাঁধ নির্মান এবং এর প্রভাবকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বিষয় নির্ধারন করে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করব।
- প্রতিটি দল তাদের প্রাথমিক যুক্তিগুলো উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে [৮ মিনিট]।
- যুক্তি খন্ডন [৬ মিনিট]
- প্রতিটি বিতর্কের উপসংহারে, গ্রুপের বাকিরা তাদের ¬মতামত ¼ প্রদান করতে পারবে।
- নিয়ম তৈরির পর ওরা বিতর্কের জন্য কিছু বিষয় নির্ধারন করল এবং সব শেষে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো বিশ্লেষন করে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করল।

আমাদের সমুদ্র সম্পদ-ব্লু ইকোনমি

বাঁধ বিতর্ক শেষে খুশি আপা সবাইকে অভিবাদন জানালেন এবং বললেন আমরা তো অনেক ধরনের কাজের মাধ্যমে দেখলাম প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে সুপেয় পানি আমাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সুপেয় পানির বাইরে আমাদের আছে এক বিশাল সমুদ্র তাই না!

রনি বলল, হ্যাঁ আপা সমুদ্রেও তো অনেক ধরনের সম্পদ আছে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ রনি। তোমরা জেনে অবাক হবে যে ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগান দিতে গিয়ে আমাদের সমুদ্রের মুখাপেক্ষী হতেই হবে। সম্প্রতি আমাদের জন্য একটা বিশেষ খুশির কারণ হয়ে উঠেছে এই সমুদ্র। আর এই সমুদ্র সম্পদ নির্ভর অর্থনীতিই হচ্ছে ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি ।

সবাই আগ্রহ ভরে জানতে চাইল সেটা কী আপা!

খুশি আপা বললেন ঠিক বলেছো রনি। তোমরা জেনে অবাক হবে যে ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগান দিতে গিয়ে আমাদের সমুদ্রের মুখাপেক্ষী হতেই হবে।সম্প্রতি আমাদের জন্য একটা বিশেষ খুশির কারণ হয়ে উঠেছে এই সমুদ্র। আর এই সমুদ্র সম্পদ নির্ভর অর্থনীতিই হচ্ছে ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি ।

সবাই আগ্রহ ভরে জানতে চাইলো সেটা কি আপা!

খুশি আপা বললেন, তাহলে চল আমরা বাংলাদেশের সমুদ্র জয় এবং সুনীল অর্থনীতি সম্পর্ক জেনে নিই

বাংলাদেশের সমুদ্রজয় এবং সুনীল অর্থনীতির দিগন্ত উন্মোচন

১৯৮২ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) -১৯৮২ প্রণীত হয়। এর ৮ বছর পূর্বেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গোপসাগরের অপার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে স্বাধীনতার মাত্র ৩ বছরের মধ্যে ‘The Territorial Waters and Maritime Zones Act, ১৯৭৪’ প্রণয়ন করেন। সে আইনে বাংলাদেশের উপকূলের বেজলাইন (Baseline) থেকে দক্ষিণে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চলকে টেরিটোরিয়াল ওয়াটার এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চলকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে দাবি করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের এ দাবির বিরুদ্ধে ভারত ও মিয়ানমার আপত্তি জানায়। ফলে ৩৮ বছর যাবৎ পার্শ্ববর্তী দুই দেশের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা অমীমাংসিত রয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যকার সমুদ্রসীমা বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ফলে ২০১২ সালের ১৪ মার্চ International Tribunal for the Law of the Sea-এর রায়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি হয়। এরপর ২০১৪ সালের ৭ জুলাই Arbitral Tribunal-এর রায়ে ভারতের সাথেও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ মীমাংসা হয়। এ রায়সমূহের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদের উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশাল সমুদ্র জয়ের ফলে বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলাসমূহ পরিচালনায় বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এর সচিব রিয়ার এ্যাডমিরাল (অবঃ) খুরশেদ আলম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এ অর্জনে সাচিবিক দায়িত্ব পালনসহ সবরকম কাজে সহযোগিতা করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

সন্নিহিত অঞ্চলে বাংলাদেশের আর্থিক, অভিবাসন, দূষণ, শুল্ক ও কর সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রয়োগের অধিকার লাভ করে। বেজলাইন থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চলকে “একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল” (Exclusive Economic Zone) বলা হয়। এ অঞ্চলে বাংলাদেশ সকল প্রকার প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ আহরণ করার অধিকার রাখে। বেজলাইন থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল অঞ্চলকে “মহীসোপান’ (Continental Shelf) বলা হয়। মহীসোপান অঞ্চলে বাংলাদেশ সকল প্রকার খনিজ সম্পদ আহরণের সার্বভৌম অধিকার রাখে। ফলে বাংলাদেশের পর্যটন, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের খোঁজ, বাণিজ্য এবং জ্বালানি সম্ভাবনা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থলসীমার মোট ক্ষেত্রফল ১ লাখ ৪৮ হাজার ৪৬০ বর্গকিলোমিটার। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বাংলাদেশের অর্জিত সমুদ্রসীমার ক্ষেত্রফল বিদ্যমান স্থলসীমার প্রায় সমআকৃতির।

সবাই আনন্দিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠলো। মিলি বললো আপা তাহলে তো আমাদের বাংলাদেশের মানচিত্রে ও কিছু পরিবর্তন আসবে তাই না!

খুশি আপা বললেন চলো তাহলে দেখি কেমন হয়েছে নতুন সমুদ্র সীমা সহ কেমন হবে বাংলাদেশের মানচিত্র, এবং ছকে আমরা আমাদের সমুদ্রের কোন কোন অঞ্চলে কি কি অধিকার পেলাম তার একটি তালিকা তৈরি করি।

অঞ্চল	কি কি অধিকার পেলাম

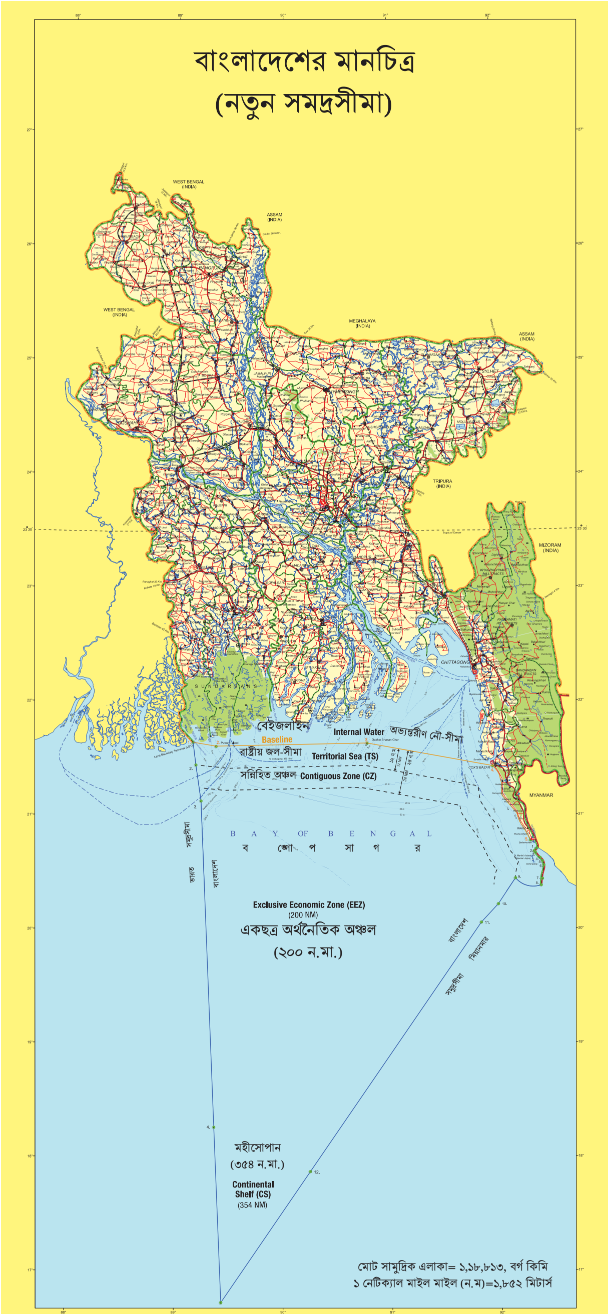

ওরা সবাই বাংলাদেশের নতুন সমুদ্রসীমাসহ মানচিত্র দেখে খুবই আনন্দ পেল। খুশি আপা বললেন, চলো এই আনন্দে এখন আমরা একটা মজার কাজ করি। একটি পানির ফোঁটা কে বাঁধের কাছে পৌঁছে দিই যেন সে বাঁধ অতিক্রম করে ওপারে চলে যেতে পারে।

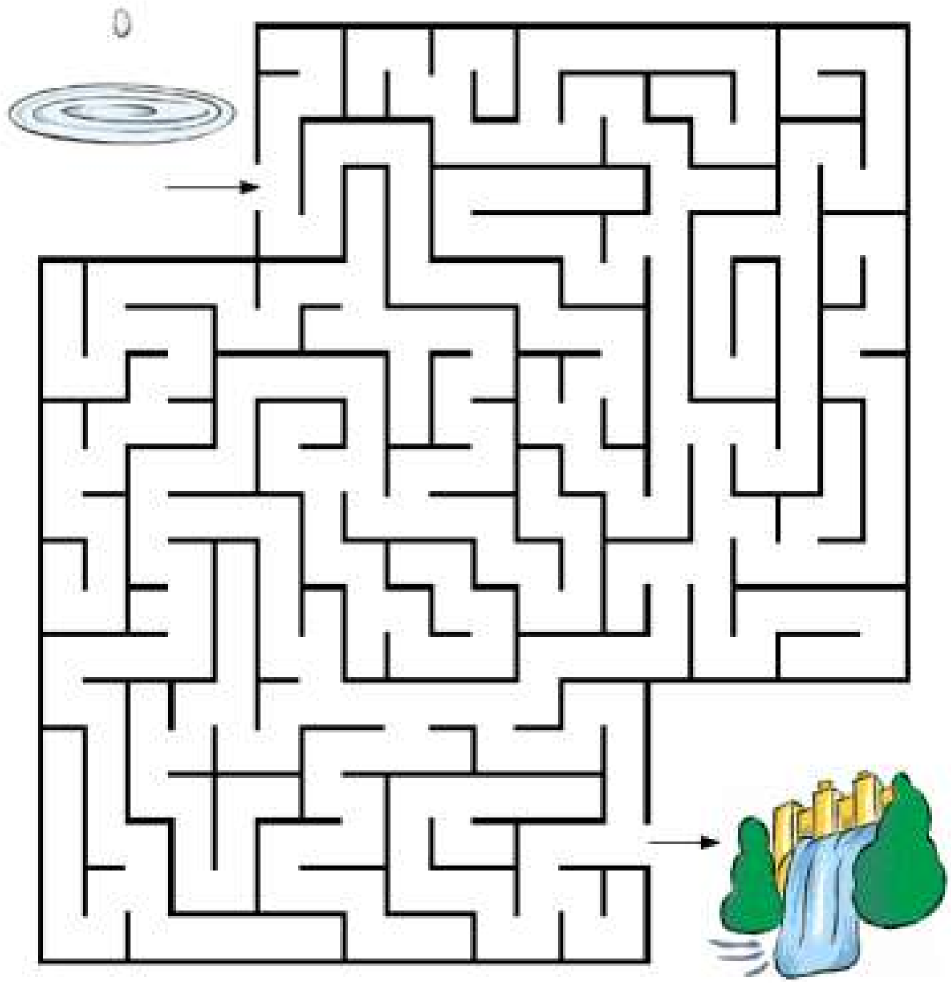

ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার

পরের দিন ক্লাসে খুশি আপা এসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন।

তখন রনি বলল, আপা আমরা আমাদের পৃথিবীর উপরি ভাগের পানির উৎসগুলো দেখলাম, কিন্তু আমরা যে পানি পান করি তার অধিকাংশই তো আসে মাটির নিচ থেকে। তাহলে মাটির নিচের পানির জন্যেও কি কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে?

মিলি বলল, রনি আমরা যদি যেকোনো সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করি তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় তাই না আপা?

খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই মিলি, যেকোনো সম্পদের পরিমিত ব্যবহারই সেই সম্পদের স্থায়িত্ব বাড়াতে পারে।

চলো আমরা কিছু ছবি দেখি:

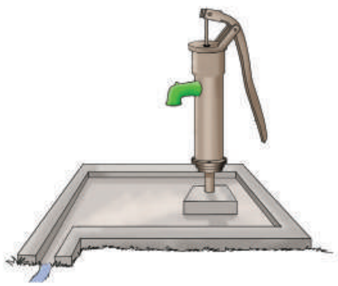

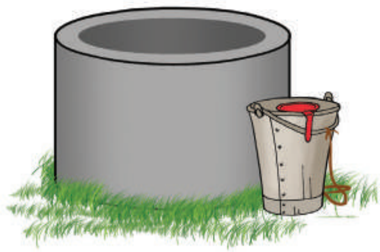

প্রশ্ন:

উপরে দেখানো ছবিতে পানির উৎসগুলো কোথায়?

এই পানি সাধারণত আমরা কোন কোন কাজে ব্যবহার করি?

মেহবুব বলল আপা এগুলো তো সবই মাটির নিচের পানি যা আমরা সাধারণত পানীয় হিসেবে বা কৃষিকাজে ব্যবহার করে থাকি। তাই এগুলো তো কোনোভাবে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা সম্ভব নয়।

মিলি বলল, তা হয়তো নয় কিন্তু বেশি বেশি তুলে নিলে আর নাও পেতে পারি।

আনুচিং বলল আপা আমাদের গ্রামের বাড়ি অর্থ্যাৎ বান্দরবানে খাবার পানির খুব সংকট, অনেক দূরের ছড়া থেকে আনতে হয়, কিন্তু যখন বৃষ্টি কম হয় তখন ছড়াগুলো শুকিয়ে যায়, আমাদের তখন অনেক কষ্ট হয়।

খুশি আপা বললেন, আসলে আনুচিং তোমরা যেখানে থাকো সেটা পাহাড়ি এলাকা, ওখানে মাটির নিচে পানির স্তর অনেক নিচে থাকে যার কারণে বৃষ্টি কম হলে বা শুষ্ক মৌসুমে ওখানে অনেক পানির কষ্ট পেতে হয়।

রনি বলল, কিন্তু আপা আমার মামার বাড়ি তো সাতক্ষীরাতে, ওখানে তো পাহাড় নেই কিন্তু ওখানেও খাবার পানির অনেক কষ্ট। আর নলকূপের পানি এত লবনাক্ত যে খাওয়াই যায় না।

মিলি বলল, আমার মনে হয় রনি সাতক্ষীরা তো সমুদ্রের অনেক কাছাকাছি আর আমরা আগেই জেনেছি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। তাই হয়তো মাটির নিচের পানির সাথে সমুদ্রের পানি মিশে যাচ্ছে আর নলকূপ দিয়ে লবণাক্ত পানি আসছে।

খুশি আপা বললেন, তোমাদের ধারণা অনেকটাই সঠিক। আচ্ছা চলো আমরা একটা মজার পরীক্ষার সাহায্যে দেখি মাটির নিচে পানির স্তর কেমনভাবে থাকে আর কী কী কারণে কী কী সমস্যা হতে পারে।

ভূপৃষ্ঠের পানি এবং ভূগর্ভস্থ পানির সম্পর্কের পরীক্ষণ:

প্রয়োজনীয় উপকরণ: ১. স্বচ্ছ প্লাস্টিক কাপ ২. বরফ চূর্ণ ৩. ভ্যানিলা আইসক্রিম ৪. স্প্রাইট/সেভেন আপ লিটার (এসব পানীয় দ্রব্য কে কার্বনেটেড পানিও বলা হয়) ৫. মিনি চকলেট চিপস/বিস্কুটের চূর্ণ ৬. ড্রিংকিং স্ট্র ৭. ফুড কালার

পদ্ধতি:

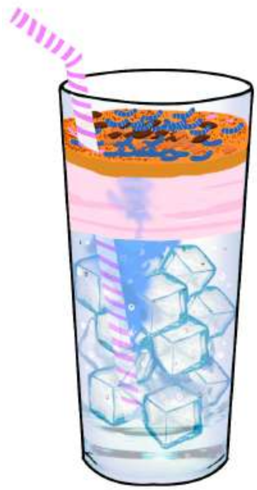

১. প্রথমে কিছু বরফের টুকরো দিয়ে একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের কাপ এর অর্ধেক পূর্ণ করে আমরা একটি মাটির নিচের জলাভূমি তৈরি করব। বরফের টুকরোগুলো ভূগর্ভস্থ পানি ধরে থাকা নুড়ি গুলোকে বোঝায়।

২. শুধু বরফ ঢেকে কার্বনেটেড পানি যোগ করি। কার্বনেটেড পানি দ্বারা আমরা ভূগর্ভস্থ পানিকে বোঝাব।

৩. এরপর আইসক্রিমের একটি স্তর যুক্ত করি (এটি বেশ শক্তভাবে জলজভূমির উপরে একটি স্তর¼ হিসাবে দেখাতে হবে)। বাস্তবে বা প্রকৃতিতে, স্তরটি কাদামাটি বা চুনাপাথর এর মতো দুর্ভেদ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি যা অভ্যন্তরে ও বাইরে পানির চলাচলে বাধা দেয়।

৪. আইসক্রিমের ওপরে মিনি চিপস বা বিস্কুটের চূর্ণ যোগ করি। এটি দ্বারা আমরা মাটির স্তর কে বোঝাব।

৫. মাটির স্তরের শীর্ষে বা উপরে খাবার রঙের কয়েক ফোঁটা যোগ করি। এই খাদ্য রং দ্বারা আমরা ভূপৃষ্ঠের যেকোনো দূষিত পানি কীভাবে ভূগর্ভস্থ পানিকে দূষিত করতে পারে সেটা দেখব। ভূপৃষ্ঠের পানি দূষণের সম্ভাব্য উৎসগুলো নিয়ে বন্ধুরা আলোচনা করি।

৬. একটি স্ট্র ব্যবহার করে আমাদের জলাভূমির কেন্দ্রে একটি ¬কূপ¼ খনন করি। ধীরে ধীরে স্ট্র

মুখে নিয়ে তরল টেনে তুলতে শুরু করি। ভূ-জলতল এর পতন খেয়াল করি। খাবারের রঙ কূপের মধ্যে চুইয়ে যাওয়ার এবং শেষ পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ পানিতে মিশে যাওয়ার সময় নোট করে রাখি। এছাড়াও লক্ষ্য করি কীভাবে কূপের চারপাশের এলাকা ডেবে যেতে শুরু করে, যা ভূগর্ভস্থ পানির হ্রাসের প্রভাবকে প্রতিনিধিত্ব করে।

৭. ধীরে ধীরে আরও কার্বনেটেড পানি যোগ করে আমাদের জলজভূমিকে পুনরায় ভর্তি করি, যা বৃষ্টির পানির সাথে ভূগর্ভস্থ পানির মিশে যাওয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে।

৮. কিছু জায়গায় কৃত্রিম রিচার্জ ব্যবহার করে জলাধারগুলোকে পূরণ করতে পারি। যেমন কূপে ইনজেকশনের মাধ্যমে বা ভূমিপৃষ্ঠের উপর পানি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যেখানে এটি মাটিতে প্রবেশ করতে পারে। প্রকৃতিতে যখন ভারী বৃষ্টি হয় তখন এভাবে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নতুন করে ভর্তি হয়।

৯. এবার আমরা যা এতক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছি তার সাহায্যে নিচের ছকটি পূরণ করি। ছকে ১, ২, ৩.... সংখ্যাগুলো দ্বারা মাটির নিচে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরগুলোকে বোঝানো হয়েছে।

পরীক্ষণ শেষে খুশি আপা বললেন, চলো এবার আমরা আমাদের ভোজ্য জলাশয়টি মজা করে খেয়ে ফেলি।

ক্রম	স্তরের বিবরণ
১	
২	
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	

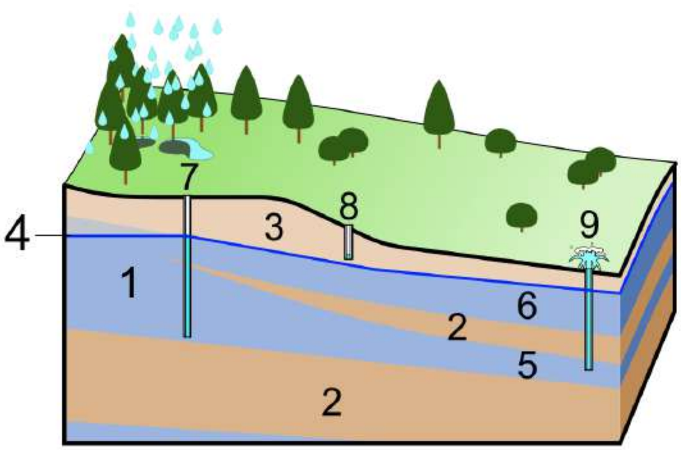

চলো আমরাও উপরোক্ত পরীক্ষণের মতো করে আমাদের ভূগর্ভস্থ পানির জলাশয়টি বানিয়ে ছকটি পূরণ করে ফেলি এবং সবশেষে সবাই মিলে মজা করে আমাদের জলাভূমিটি খেয়ে ফেলি।

পরীক্ষণ শেষে মিলি বলল, আপা আমরা তো দেখলাম যখন মাটির নিচের পানি আমরা অতিরিক্ত টেনে তুলছিলাম তখন মাটির নিচে ও ওপরে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল।

খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ মিলি আমরা যদি আমাদের পরীক্ষণের সাথে প্রকৃতির উপাদানগুলো মিলিয়ে দেখি তাহলে খুব সহজেই আমরা ধরতে পারব কী কী সমস্যা হতে পারে যদি আমরা অনেক বেশি পানি মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করি।

শিহান বলল আপা দিনদিন পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, আর এই বেশি মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য গড়ে উঠছে বেশি বেশি কলকারখানা।

আনুচিং বলল হ্যাঁ আর কলকারখানায় তো অনেক পানি লাগে। যার ফলে বেশি পানি তোলার প্রয়োজন হবে এবং পানির স্তর ক্রমাগত নেমে যাবে এবং পানি তোলার ব্যয় ও বেড়ে যেতে পারে।

রনি বলল, পানির প্রাপ্যতা কমে পেতে পারে এমনকি ভূগর্ভস্থ পানিতে দূষণের ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে।

মিলি বলল, মাটির নিচ থেকে অতিরিক্ত পানি তোলা চলতে থাকলে ভূমিধ্বসের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

খুশি আপা বললেন, চমৎকার তোমরা সবাই যদি এভাবেই সমস্যা চিহ্নিত করতে পারো নিশ্চয় আমাদের দায়িত্ব কী কী হবে সেগুলোও তোমরা খুঁজে বের করতে পারবে তাই না?

ওরা সবাই একসাথে বলে উঠল অবশ্যই আপা।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে ওদের এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি টেকসই ব্যবস্থাপনায় কী কী কর্মসূচী নেওয়া যায় তা ঠিক করল এবং কাজটি শেষ হলে কেউ কেউ লিখে আবার কেউ কেউ ছবি এঁকে তা উপস্থাপন করল।

মিলি ও তার বন্ধুদের তৈরি ভূগর্ভস্থ পানি রক্ষার উপায় সম্পর্কিত পোস্টার

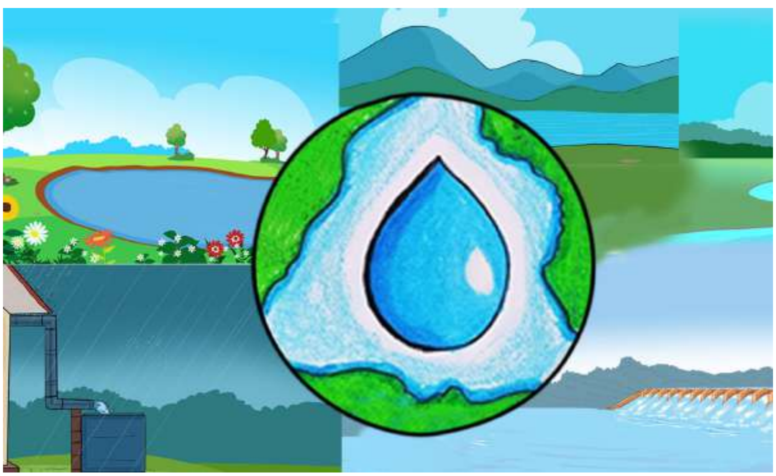

চলো আমরাও আমাদের এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি রক্ষায় কী কী কর্মসূচী নেওয়া যেতে পারে তা বন্ধুরা মিলে ঠিক করি এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের সহযোগিতায় তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি।

খনিজ সম্পদ-জীবাশ্ম জ্বালানি

সালমা আজ ক্লাসে এসে বলল ও আজ স্কুলে আসার সময় শুধু শুকনো খাবার খেয়ে এসেছে কারণ ওদের বাসায় আজ সকাল থেকে রান্নার গ্যাস নেই। [সবাই মিলে কথা বলছে এমন একটি ছবি}

রনি বলল, তাদের বাসায়ও একই অবস্থা।

আনুচিং বলল এই যে আমরা রান্না বা কলকারখানায় গ্যাস ব্যবহার করি বা গাড়িতে যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় এই এত এত গ্যাস কোন জায়গা থেকে আসে?

মিলি বলল, কেন আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে তো জেনেছিলাম প্রাকৃতিক গ্যাস ও একটি সম্পদ।

শিহান বলল হ্যাঁ আর এটি একটি অনবায়ন যোগ্য সম্পদ।

রনি বলল, ও হ্যাঁ কিন্তু যেহেতু এটা অনবায়নযোগ্য সম্পদ তাহলে তো এটা ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না!

মিলি বলল, তাহলে তো খুব বিপদ হবে।

এই সময় খুশি আপা ক্লাসে প্রবেশ করে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং জানতে চাইলেন ওরা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছে।

মিলি বলল, আপা আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমাদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে যদি প্রাকৃতিক গ্যাস একসময় শেষ হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের খুব সমস্যায় পড়তে হবে।

খুশি আপা বললেন, এটা আসলেই চিন্তার বিষয়, তবে যেকোনো সমস্যারই তো কোনো না কোনো সমাধান থাকে তাই না!

রবিন বলল ঠিক তাই আপা এবং আমাদের উচিত দুশ্চিন্তা না করে সেই সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।

খুশি আপা বললেন, চমৎকার প্রস্তাব চলো তাহলে আমরা আগে একটি ফ্লো-ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখে নিই প্রাকৃতিক গ্যাস বা এ ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি কীভাবে তৈরি হয়।

কীভাবে কয়লা তৈরি হয়

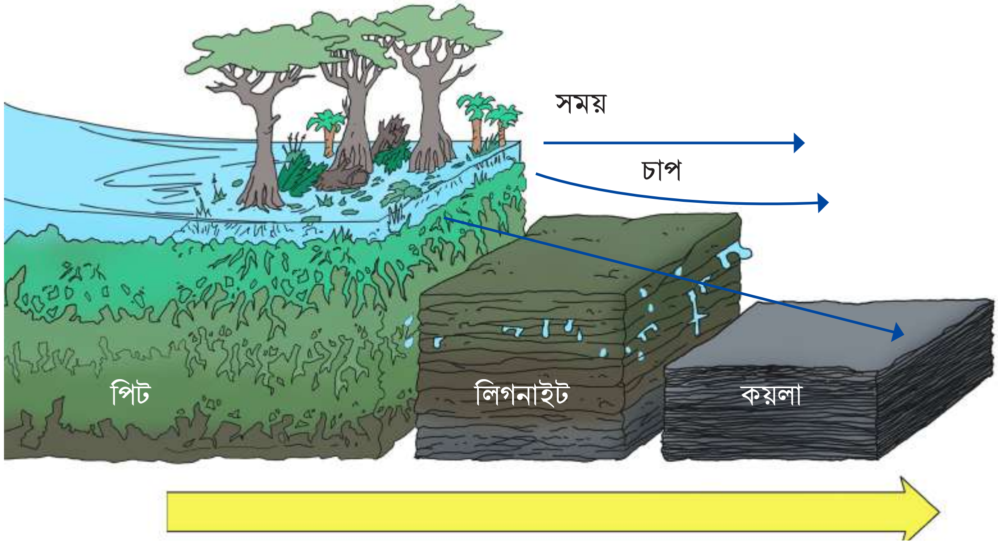

১. কোটি কোটি বছর আগে, পৃথিবীর বড় একটা অংশ জলাভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। যখন জলাভূমির উদ্ভিদগুলো প্রাকৃতিক/অন্য কোনো অজানা কারনে মারা গেল তখন তারা নীচে ডুবে গেল।	
২. ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিদ একটি নরম স্তর তৈরি করল যাকে পিট বলে। সময়ের সাথে সাথে এই পিট কাদা এবং বালুর নিচে চাপা পড়ে গেল।	৩. সময়ের সাথে ধীরে ধীরে এই কাদা ও বালু পাথরে পরিণত হলো এবং পিট কয়লায় পরিবর্তিত হয়ে গেল।

জেনে রাখ

জীবাশ্ম জ্বালানি হলো এক প্রকার জ্বালানি যা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী মাটির নিচে উচ্চ তাপ ও চাপে হাজার হাজার বছর ধরে বায়ুর অনুপস্থিতিতে পচন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির উদাহরণ: কয়লা,প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল।

ডায়াগ্রাম দেখা শেষ হলে রনি বলল, আপা তাহলে তো যেকোনো জীবাশ্ম জ্বালানী তৈরি হতে অনেক অনেক বছর সময় লাগে!

খুশি আপা বললেন, হ্যাঁ রনি ঠিক বলেছ।

আনুচিং বলল আপা আমরা তো জানি যে জীবাশ্ম জ্বালানী একপ্রকার খনিজ সম্পদ। আমাদের দেশেও যেমন নানা ধরনের খনিজ সম্পদ আছে তেমন পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও তো আছে তাই না?

খুশি আপা বললেন, আমরা সেটা কিসের সাহায্য নিয়ে বের করতে পারি?

সবাই একসাথে বলে উঠল মানচিত্র......

তখন খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে পৃথিবীর মানচিত্র ও বাংলাদেশের মানচিত্রের সাহায্যে খুঁজে বের করি পৃথিবীর ও বাংলাদেশের কোথায় কোথায় কী কী ধরনের খনিজ সম্পদ আছে এবং তা ছকে পূরণ করে ফেলি।

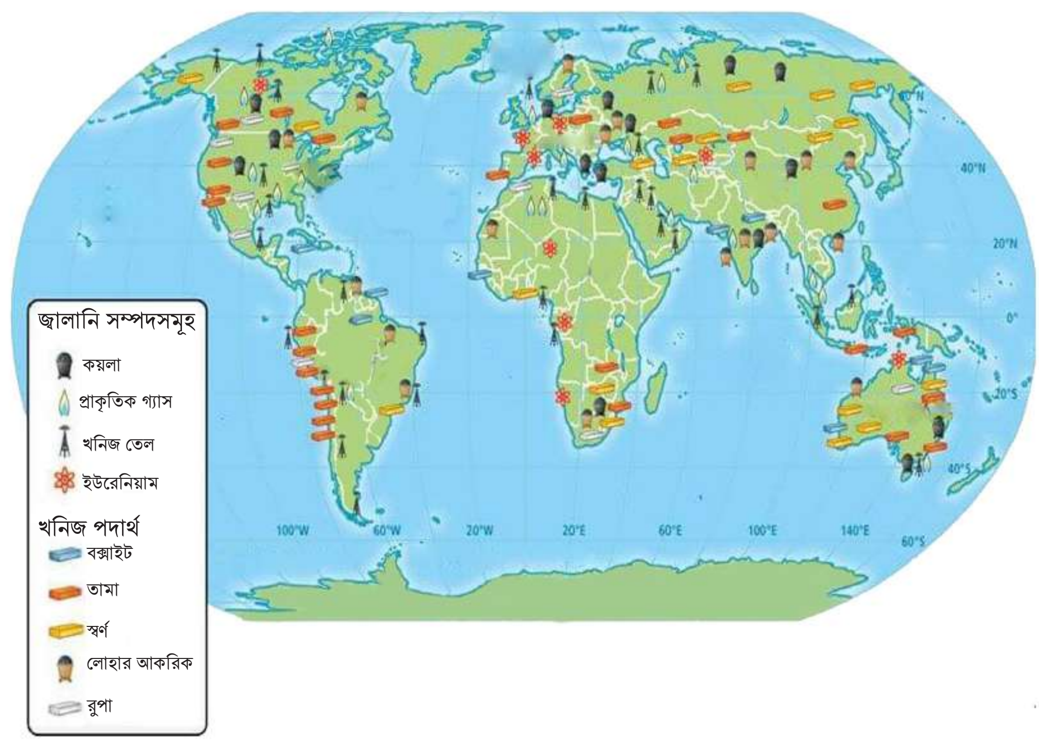

বাংলাদেশ
খনিজ সম্পদ
কিলোমিটার
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
মিজোরাম (ভারত)
কর্কটক্রান্তি রেখা
বঙ্গোপসাগর
আরাকান (মিয়ানমার)
চিন প্রদেশ (মিয়ানমার)
প্রাকৃতিক গ্যাস
খনিজ তৈল
কয়লা
পিট
চুনাপাথর
কঠিন শিলা
ভারী মানিক
চীনামাটি
কাঁচবালি

পৃথিবীর মানচিত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য পূরণের ছক

খনিজ সম্পদের নাম	বিদ্যমান মহাদেশের নাম

বাংলাদেশের মানচিত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য পূরণের ছক

খনিজ সম্পদের নাম	বিদ্যমান স্থানের নাম

ছক পূরণের কাজটি শেষ হলে সালমা বলল আপা আমরা অনেক ধরনের খনিজ সম্পদ দেখলাম, আবার আমাদের বাংলাদেশেও অনেক ধরনের খনিজ সম্পদ আছে। এখন যদি আমরা একটি প্রকল্পভিত্তিক কাজ এর মাধ্যমে এসব সম্পদ কী অবস্থায় আছে, কোন সম্পদ কী কী কাজে লাগে অথবা এসব সম্পদ উত্তোলনের সময় কী কী পরিবেশ গত সমস্যা হতে পারে এবং এসব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপায় বের করে আনতে পারি তাই না আপা!

খুশি আপা বললেন, খুব ভালো প্রস্তাব তোমরা প্রকল্পভিত্তিক কাজ ষষ্ঠ শ্রেণিতে করেছ। তাহলে তোমরা তোমাদের কাজ শুরু করে দাও।

তখন ওরা প্রথমে দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দল একটি করে খনিজ সম্পদ বেছে নিল। তারপর ওরা যা যা জানতে চায় সেসব বিষয়ের ওপর প্রশ্ন তৈরি করল।

প্রশ্ন:

প্রশ্ন তৈরি করা হলে সাফিন ওর বন্ধুদের বলল এখন তথ্য সংগ্রহ করার কাজটি আমরা কীভাবে করতে পারি?

রনি বলল, সব থেকে ভালো উপায় আমরা যদি সরাসরি একটি খনি এলাকা দেখতে যায়, আর আমাদের দেশে তো অনেক বড় বড় কয়লাখনি আছেই।

রবিন বলল খুব ভালো প্রস্তাব।

শিহান বলল আমার এক চাচা আছেন যিনি বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে কাজ করেন। আমরা তার সাহায্য নিতে পারি।

মিলি বলল, এতো অনেক ভালো প্রস্তাব এছাড়া আমরা ইন্টারনেট থেকে ভিডিও, তথ্য অথবা এই বিষয়ের ওপর লেখা বইয়ের সাহায্য নিতে পারি।

রনি বলল, অবশ্যই তা করতে হবে। কারণ এটি প্রকল্পভিত্তিক কাজ আর এ কাজে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা একটি ধাপ আছে তাই না?

শিহান বলল ঠিক বলেছ রনি, আর এবার আমাদের প্রকল্পের ফলাফল আমরা ইলেকট্রনিক পত্রিকা/হাতে তৈরি পত্রিকা তৈরি করে প্রকাশ করব কেমন হবে?

মিলি বলল, এটা অনেক ভালো প্রস্তাব, কারণ আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ক্লাসে তো এটা শিখেছি। আর ই-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের বাইরেও অনেককে খুব সহজেই আমাদের কাজ সম্পর্কে জানাতে পারব।

এরপর ওরা সবাই খুশি আপার সহযোগিতায় ওদের এলাকার কাছাকাছি একটি কয়লাখনিতে ভ্রমণের নিয়মাবলি মেনে পরিদর্শন করল। পরে প্রকল্পের কাজটি শেষ করে ওদের প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি ইলেকট্রনিক পত্রিকা তৈরি করল।

পত্রিকার কাজ শেষ হলে খুশি আপা বললেন, তোমরা অনেক সুন্দরভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে কীভাবে আমরা আমাদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখতে পারি তা দেখিয়েছো।

সম্পদের ব্যবহার ও টেকসই উন্নয়ন

কাজটি শেষ হলে আনুচিং বলল আপা আমরা তো দেখলাম পৃথিবী এবং বাংলাদেশে কী কী ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে আর মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে কীভাবে এসব সম্পদ দিন দিন ব্যবহারের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। এসব দেখে আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে

খুশি আপা বললেন, কী ধরনের দুশ্চিন্তা আনুচিং?

আনুচিং বলল আপা দিন দিন তো মানুষের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু এসব সম্পদের পরিমাণ তো দিন দিন কমছে, আর একবার শেষ হয়ে গেলে তো আর এটা সহজে পাওয়া যাবে না! তাহলে আমাদের কি এসব সম্পদ ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত?

মিলি বলল, কিন্তু ব্যবহার বন্ধ করে দিলে তো আমাদেরও অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে! পানি ছাড়া বেঁচে থাকব কি করে! এক দিন বাসায় গ্যাস নেই সে জন্যই খাবারের কত কষ্ট পেলাম!

রনি বলল, তাহলে উপায়!

শিহান বলল আমরা যদি এসব সম্পদের ব্যবহারে যত্নবান হই অর্থ্যাৎ অপচয় না করি তাহলে নিশ্চয় কিছুটা খরচ কম হবে তাই না?

রনি বলল, আবার যদি অন্য কোনো উৎস খুঁজে পাই! যেমন- সৌরশক্তিকে তো কাজে লাগানো যেতে পারে, এটা তো সহজে শেষ হবে না তাই না?

মিলি বলল, বাতাসের শক্তিকে আবার বৃষ্টির পানিকে ও কাজে লাগাতে পারি!

খুশি আপা বললেন, অর্থ্যাৎ তোমরা বলতে চাইছ আমরা যদি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার করতে পারি তাহলে কিছুটা সমস্যা কম হতে পারে তাই তো?

সবাই একসাথে বলল ঠিক তাই আপা।

খুশি আপা বললেন, আমরা এতক্ষণ যেভাবে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কথা বলছি এটাকে বলে টেকসই ব্যবস্থাপনা। আর কোনো কিছুর ব্যবস্থাপনা টেকসই করতে গেলে প্রথমে সেটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে।

জেনে রাখ

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সেসব উন্নয়ন কর্মকান্ড যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি বা বাঁধার কোন কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পিত উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন বা Sustainable Development।

রনি বলল, আপা এই পৃথিবী আমাদের বেঁচে থাকার সবকিছুই দিয়েছে। এখন আমাদের সময়, আমাদের এমন কিছু কাজের দায়িত্ব নিতে হবে যে কাজের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল সম্পদ যেমন আমরা ব্যবহার করে বেঁচে আছি তেমনিভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ব্যবহার করে বেঁচে থাকতে পারে।

মিলি বলল, ঠিক তাই নাহলে তো এই পৃথিবীতে মানবসভ্যতা আর টিকে থাকতে পারেনা।

খুশি আপা বললেন, তোমাদের কথা একদম সঠিক। তাহলে এখন আমাদের করণীয় কি হতে পারে?

মিলি বলল, আপা আমরা যদি আমাদের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব ও সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি, যা এসব সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে তাহলে কেমন হবে?

রনি বলল, খুবই ভালো প্রস্তাব।

চলো তাহলে আমরা কীভাবে সম্পদের ব্যবহার টেকসই করা যায় এবং আমাদের সবার পরিবারে, আমাদের বিদ্যালয় অথবা আমাদের এলাকায় সেসব কাজ বাস্তবায়নের উপায়সমূহ আলোচনা করে বের করি।

তখন ওরা দলে ভাগ হয়ে পরিবার, বিদ্যালয় ও নিজেদের এলাকায় সম্পদের টেকসই ব্যবহারে ভূমিকা রাখে এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করল যা তারা বছরব্যাপী নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে।

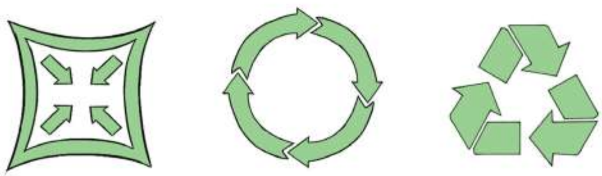

কমানো পুনরায় ব্যবহার পুনর্ব্যবহার

পরিবারে সম্পদের টেকসই ব্যবহারমূলক কাজ:

১. ব্যবহারের সময় ছাড়া পানির কল বন্ধ রাখা

২. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিদ্যুতের সুইচ বন্ধ করা

৩. বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা।

৪. ....

৫. ....

৬. ....

বিদ্যালয়ে সম্পদের টেকসই ব্যবহারমূলক কাজ:

১. বিদ্যালয়ে যেখানে বর্জ্য উৎপন্ন হয় তা পর্যবেক্ষণ করা এবং যেখানে পুনর্ব্যবহার হতে পারে তা নোট করা।

২. শ্রেণিকক্ষ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য এলাকায় আলো বন্ধ করে রাখা যখন সেগুলি ব্যবহার করা হয় না।

৩. শক্তি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার না করার সময় কম্পিউটারগুলোকে স্লিপ মোডে রাখতে সবাই কে অনুরোধ করা।

৪. ....

৫. ....

৬. ....

সমাজে সম্পদের টেকসই ব্যবহারমূলক কাজ:

১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পচনশীল ও অপচনশীল এই দুই ধরনের বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ।

২. এলাকায় পুকুর, খাল বা অন্যান্য পানির উৎস যা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করে তোলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ।

৩. এলাকায় পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সচেতনতামূলক পোস্টার বিলি করা।

৪. ....

৫. ....

৬. ....

শেষে ওরা পরিবার ও বিদ্যালয়ের যে যে কাজ এর তালিকা করেছিল সেগুলো বাস্তবায়ন শুরু করল আর এলাকার টেকসই উন্নয়নমূলক কাজগুলো এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা ও বয়স্ক ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

খুশি আপা ওদের কাজ দেখে খুব খুশি হলেন, বললেন তোমরাই পারবে এক দিন এই্ পৃথিবীটাকে বদলে দিতে।

শরণার্থী: ১৯৭১

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পেতে এদেশের মানুষ বিভিন্ন পথে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

সপ্তম -শ্রেণি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অনুশীলন বই

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য